বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

“শতরঞ্জি ও হস্তশিল্পে নারীদের কর্মসংস্থান উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চন্দনপাট ইউনিয়ন।”

“শতরঞ্জি ও হস্তশিল্পে নারীদের কর্মসংস্থান উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চন্দনপাট ইউনিয়ন।”

জেলা প্রশাসন,
রংপুর।

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ
রংপুর সদর, রংপুর।

“শতরঞ্জি ও হস্তশিল্পে নারীদের কর্মসংস্থান উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চন্দনপাট ইউনিয়ন।”

দিক নির্দেশনায়	ঃ	জেলা প্রশাসন, রংপুর।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	স্থানীয় সরকার শাখা, রংপুর।
রচনা ও প্রকাশনায়	ঃ	৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।
পৃষ্টপোষকতায়	ঃ	মোঃ আমিনুর রহমান, চেয়ারম্যান, ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।
উপদেষ্টা	ঃ	মোছাঃ জিলুফা সুলতানা উপপরিচালক (উপসচিব) স্থানীয় সরকার, রংপুর।
সম্পাদক	ঃ	মোঃ আমিনুর রহমান, চেয়ারম্যান, ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।
সহযোগী সম্পাদক	ঃ	মোঃ মোকছেদুর রহমান, ইউপি সচিব, ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।
সহযোগীতায়	ঃ	মোঃ এমদাদুল হক, প্রধান শিক্ষক, সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
আলোক চিত্র	ঃ	মোঃ মাহাবুব ইসলাম, মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, মোঃ নয়ন মিয়া।
কম্পিউটার কম্পোজ	ঃ	সাধন চন্দ্র সরকার। হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার আপারেটর, ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর।
মূল্য	ঃ	৭৫০ (সাতশত পঁঞ্চাশ) টাকা।
কপিরাইট	ঃ	৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ, রংপুর সদর, রংপুর। কর্তৃক সরবরাহ সংরক্ষিত।

“শতরঞ্জি ও হস্তশিল্পে নারীদের কর্মসংস্থান উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চন্দনপাট ইউনিয়ন।”

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১	ব্র্যান্ডিং লোগো ও ট্যাগলাইন পরিচিতি	১
২	চন্দনপাট ইউনিয়নের ম্যাপ	১০
৩	চন্দনপাট ইউনিয়নের পরিচিতি	১১
৪	গ্রামের নাম ও প্রতিটি গ্রামের বৈশিষ্ট্য	১২
৫	এক নজরে চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ	১৩
৬	চন্দনপাট ইউনিয়নের ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৫
৭	মুক্তিযোদ্ধ কালিন চন্দনপাট ইউনিয়ন	১৬
৮	শান্তি ও নিরাপত্তায় চন্দনপাট ইউনিয়ন	২৩
৯	চন্দনপাট ইউনিয়নের বিচার ব্যবস্থা	২৪
১০	চন্দনপাট ইউনিয়নের হাট বাজার সমুহ	২৫
১১	সাফল্যগাথা	৩১
১২	কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্পের বর্ণনা	৪২
১৩	চন্দনপাট ইউনিয়নের বিনোদন কেন্দ্র	৪৬
১৪	চন্দনপাট ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহ	৪৯
১৫	চন্দনপাট ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	৬৪
১৬	চন্দনপাট ইউনিয়নের কৃষি	৬৮
১৭	চন্দনপাট ইউনিয়নের নদী ও খাল বিল	৭৭
১৮	চন্দনপাট ইউনিয়নে অবস্থিত সরকারী স্থাপনা সমুহ	৮৯
১৯	চন্দনপাট ইউনিয়নে অবস্থিত বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমুহ	৯৩
২০	চন্দনপাট ইউনিয়নের খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	৯৫
২১	চন্দনপাট ইউনিয়নের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমুহ	১০১
২২	চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক পরিষদ কতৃক বাস্তবায়িত কিছু উন্নয়ন চিত্র	১০৮
২৩	চন্দনপাট ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন ছবি	১১৫

মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান
জেলা প্রশাসক
রংপুর।

বাণী

একটি ইউনিয়নের সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিই ইউনিয়ন-ব্র্যান্ডিং এর মূল অভিলক্ষ্য। ইউনিয়নের সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমনঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষি, পণ্য, পর্যটন, কুটির শিল্প সংস্কৃতিবা জনমুখী উদ্যোগ। ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং ইউনিয়নের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক ইউনিয়ন এক পর্যায় কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং ইউনিয়নের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণ করতে গুরুত্ব ভুমিকা পালন করবে।

তৃনমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরতে ইউনিয়ন- ব্র্যান্ডিং উন্নয়নের সোপান হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং নৈতিক পর্যায়ে নতুন নতুন উদ্যোগ তৈরী এবং তা বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বেগবান করবে। ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ের অগ্রনী লক্ষ্য অর্জনে উদ্যোগতা গণের সহিত সংশ্লিষ্টজেলার সকল দপ্তর/বিভাগ/সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে অগ্রনী ভুমিকা পালন করবে।

স্থানীয় সরকার, রংপুর ও উপজেলা প্রশাসন, রংপুর সদর এর সহায়তায় রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ ইতোমধ্যেই তাদের ব্র্যান্ডিং এর বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরী এবং তা বাস্তবায়নে স্বপ্ল, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং দেশে পরিচিত করে তুলতে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন যে বিস্তৃত উদ্যোগগ্রহণকরেছে তার মধ্যে একটি হলো ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং -বুক প্রকাশনা।

তথ্য সমৃদ্ধ নান্দনিক ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং -বুক প্রকাশনার জন্য স্থানীয় সরকার, রংপুর, উপজেলা প্রশাসন, রংপুর সদর, চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং ইউনিয়ন- ব্র্যান্ডিং কাজের সাফল্য কামনা করি।

.

(মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান)

মোছাঃ জিলুফা সুলতানা
উপপরিচালক

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারঅনন্য নেতৃত্বে ও অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ মহাযাত্রায় ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততা বহুমাত্রিক। টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট অর্জনে রংপুর জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ নিজ নিজ ইউনিয়নের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, পর্যটন, পণ্য উদ্যোগ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরসমন্বয়ে সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশে “ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং” নামে বিপুল কার্যক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি ইউনিয়নের অমেয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং এর মূল অভিলক্ষ্য। ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং ইউনিয়নের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন ও কুটির শিল্পের বিকাশ, “এক ইউনিয়ন এক পণ্য কর্মসসূচির” বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং ইউনিয়নের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের স্তরে কার্য্যকর ভূমিকা পালন করেছ। ইউনিয়নের বিখ্যাত পণ্যের প্রসার, বিশেষ কোন উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং কুটির ও পর্যটন শিল্পের সুচারু বিকাশে “ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং”অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্থানীয় সরকার, রংপুর ও উপজেলা প্রশাসন, রংপুর সদর-এর সহায়তায় রংপুর জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে জেলার সকল ইউনিয়নের ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে কার্য্যকর ভাবে তুলে ধরতে “ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং -বুক” প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রত্যাশা করি “ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিংয়ের” প্রচার এবং সমৃদ্ধিতে এই “ব্র্যান্ডিং-বুক” কার্য্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

“ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং বুক”-এর প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোছাঃ জিলুফা সুলতানা)

মোছা: নাছিমা জামান ববি
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
রংপুর সদর, রংপুর।

বাণী

ইতিহাস ঐতিহ্য বাংলাদেশের প্রাচীনতম জেলা হিসাবে রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার স্বীকৃতি পুরো দেশ জুড়ে। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত আমার গ্রাম -আমার শহর (২০১৯-২০২৩) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামীন জনপদকে উন্নয়ন ও সভ্যতার বিকাশ লাভের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন তানিয়েই আমাদের ছুটে চলা । ঠিক সেই লক্ষ্য ও পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে রংপুর সদর উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ যাতে শহরের আদলে গড়ে ওঠে তানিয়ে কাজ করছি প্রতিনিয়ত। প্রতিটি ইউনিয়ন প্রতিটি ওয়ার্ড যাতে আধুনিক শহরের আধুনিক সকল সুবিধাদি পায় সেই কথা মাথায় রেখে এ. টু. আই এর সহযোগীতায় ইউনিয়ন শেখ রাসেল ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়। যার ফলে এখান থেকে গ্রামীন জনপদ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা যেমন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন ব্যবস্থা,ভূমি বিষয়ক সকল অনলাইন সেবা, চাকুরী প্রত্যাশী সকল তরুনদের কম্পিউটার প্রশিক্ষন সহ অনেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া রংপুর সদর উপজেলার সকল রাস্তা ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা, সুচিকিৎসা,মানসম্মত শিক্ষা, কম্পিউটার ও দ্রতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা বৈদ্যতিক সুবিধা সহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপন্যের বাজার সম্প্রসারনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা বাস্তবায়নের কথা মাথায়রেখে এগিয়ে যাচ্ছি বা কাজ করে যাচ্ছি। রংপুর সদর উপজেলা একটি কৃষির অভয়রন্য বা ভান্ডার বলা যায়। এখানকার মানুষের জীবিকার বেশিরভাগ মানুষ কৃষি কাজের উপড় নির্ভড় করে আছে।তাই সেগুলো মাথায় রেখে প্রতিটি ইউনিয়ন প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায় কৃষি যন্ত্র, কৃষি সেবা মুলক প্রকল্প, কৃষি কাজকে আধুনিকায়ন করার জন্য ওয়ার্কসপ স্থাপন করে যন্ত্রপাতি মেরামত সহ গ্রামীন যান্ত্রিকরন সেবা সম্প্রসারন মুলক কাজ করে যাচ্ছি ।যার ফলে এসব পদক্ষেপ এর মাধ্যমে যুবক ও কৃষি উদ্যোগতাদের প্রশিক্ষন দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখছে । যা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিস্মরনীয় ভুমিকা রাখছে।ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং বই হচ্ছে একটি ইউনিয়নের জনপদ ইতিহাস ঐতিহ্য , সংস্কৃতি কৃষি ও শিল্পকে বহি:প্রকাশ করা। ঠিক সেই লক্ষে রংপুর সদর উপজেলার ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ফাইনালি কাজটি সফলতার সাথে শেষ করতে পেরেছে তার জন্য অত্র উপজেলার চেয়ারম্যান হিসাবে গর্ববোধ করছি।

আলহামদুলিল্লাহ 'পরম করুনাময় আল্লাহ পাকের দয়া এবং রংপুর সদর উপজেলার সকলের দোয়া ও ভালবাসায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২৩ অর্জন করি। চন্দনপাট ইউনিয়ন সহ সদর উপজেলার সকল নাগরিক এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাই এই অর্জিত ও স্বীকৃত পুরস্কার আপনাদের কাছে উৎসর্গ করছি।তার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর প্রতি যাতে কিনা আমার মত অতি সামান্য রাজনীতি কর্মী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে এই মহান পুরুস্কারে ভূষিত করার জন্য। সবশেষে যে ভাবে অনুপ্রানিত করেছেন তা সত্যি আমাকে কাজের প্রতি আরও আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

পরিশেষে, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে যারা এই ব্যান্ডিং এর কাজের সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহ অত্র ইউনিয়ন ব্যান্ডিং বই যাতে পরবর্তীতে অন্যদের অনুপ্রেরনা জোগায় সেই আশা ও কামনা রাখছি।

মোছা: নাছিমা জামান ববি
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
রংপুর সদর, রংপুর।

মোঃ নাইম হাসান খান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রংপুর সদর, রংপুর।

বাণী

রংপুর জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। কোন ইউনিয়নে রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পসরা সাজানো, কোথাও লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন ইউনিয়ন কৃষিজ পণ্যের জন্য বিখ্যাত, কোন ইউনিয়ন ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ। জেলার প্রতিটি ইউনিয়নের এসকল বৈশিষ্ট্য দেশের কাছে তুলে ধরে ইউনিয়নের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দেশবাসীকে জানানোর মাধ্যমে বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং অনন্য ও দুরদৃষ্টি-সর্ম্পূণ একটি উদ্যোগ ।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিরন্তকভাবে উপস্থাপণের একটি অন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ডিং -বুক। এই ব্র্যান্ডিং -বুক ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয় ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যারা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাদের জন্য তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইউনিয়ন-ব্র্যান্ডিং বুক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা এ ইউনিয়নের ব্র্যান্ডিংয়ের দেশে তুলে ধরতে আর কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। রংপুর জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যারা প্রকাশনাটি সম্পূর্ণ করেছেন আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ নাইম হাসান খান)

“শতরঞ্জি ও হস্তশিল্পে নারীদের কর্মসংস্থান উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় চন্দনপাট ইউনিয়ন।”

মোঃ আমিনুর রহমান
চেয়ারম্যান
৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ
রংপুর সদর, রংপুর।

মুখবন্ধ

মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন দুরদর্শী নেতা যিনি এ দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর এ সুদৃঢ় প্রত্যয়েরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরেছেন। রংপুর জেলার প্রতিটি ইউনিয়নকে স্বতন্ত্রভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করার নির্মিত্ত জেলা প্রশাসন, রংপুর, স্থানীয় সরকার, রংপুর ও উপজেলা প্রশাসন, রংপুর সদর এর আওতায় “ইউনিয়ন ব্র্যান্ডিং”কর্মসূচীটি তেমনই একটি উদ্যোগ।

রংপুর জেলার বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কারণে সারাদেশে সমাদৃত। এ জেলার প্রতিটি ইউনিয়ন বিভিন্নভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। রংপুর সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়ন তেমনি একটি ইউনিয়ন। চন্দনপাট ইউনিয়নে বিদ্যমান ঐতিহ্য, গৌরব ও মর্যাদাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই যুপোপযোগী প্রচারণার পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের চন্দনপাট ইউনিয়ন আরও সমৃদ্ধশালী, পর্যটনে, বিকশিত, বিনিয়োগবান্ধব এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে বলে আমি আশাবাদী।

“চন্দনপাট ইউনিয়ন- ব্র্যান্ডিং”বইটি ইউনিয়নের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনীয় স্থানসমুহকে সকলের সামনে তুলে ধরার নিমিত্তে প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সাথে এ ইউনিয়নের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমুহের সাথে দেশের সকল স্তরের জনসাধারণের নিকট বিশেষমত পর্যটকদের পরিচিত করানো এবং তাদের উল্লেখ্যযোগ্য দর্শণীয় স্থান লাহিড়ীরহাট বধ্যভূমি। কারুপণ্য রংপুর লিঃ এ অত্র এলাকার নারীরা কর্মের সুযোগ করে দেয়ায় এবং নারীদের সামাজিক অবস্থান তৈরীতে সহযোগীতা করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। রাজনৈতিক নেতৃবন্দ, সুশীল সমাজ সর্বোপরি যারা এ মহতী কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সহযোগিতা করেছেন এবং করিতেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। আগামী দিনে চন্দনপাট ইউনিয়ন হয়ে উঠুক আরো বেশী সমৃদ্ধ, নারী বান্ধব, সম্ভাবনাময় এবং এতদঞ্চলের স্বকীয় ও অভিন্ন পরিচিতির ধারক ও বাহক।

(মোঃ আমিনুর রহমান)

এক নজরে চন্দনপাট ইউনিয়ন

শিরোনাম/খাত/বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	শিরোনাম/খাত/বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
ইউনিয়ন কোড	১৭	ইউনিয়রে মোট আয়তন	৫৫.৩৮ বর্গকিলোমিটার (২১.৩৮) বর্গমাইল
জনসংখ্যা	৩২৫৬৯ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী)	মৌজা	১০ টি
নারী	**১৬২৪৮**	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১ টি
পুরুষ	১৬৩২১	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪ টি
মুসলিম	৮৪.৭৮%	পোস্ট অফিস	০৪ টি
হিন্দু	১৫.১৭%	পোস্ট কোড	৫৪৩১
অন্যান্য	০.০৫%	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭ টি
উপজাতী	০	নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১ টি
খানা সংখ্যা	৯০২৫ টি	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৩ টি
কর প্রদানকারী পরিবার	৯০২৫	মহাবিদ্যালয়	০৩ টি
ভোটার সংখ্যা	২৪৮৫৩ জন	দাখিল মাদ্রাসা	৩ টি
ব্যাংক	০৫টি	ক্বওমি/হাফেজিয়া মাদ্রাসা	১৫টি
এনজিও	০৮ টি	মসজিদ সংখ্যা	৫৬ টি
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার	০১ টি	মন্দির সংখ্যা	২০ টি
শিক্ষার হার	৪৯.৩৮%	হাট-বাজার	৫ টি
নারী শিক্ষার হার	৪৭.৫২%	পুরুষ শিক্ষার হার	৫১.২৪%
শ্রমিক পেশাজীবী	২৫.৪৬%	কৃষি পেশায় যুক্ত	৫৮.৫৪%
চাকুরীজীবী	৩.৪৮%	ব্যবসায়ী পেশাজীবী	৭.৬৫%
পাকা রাস্তা	৩৯.৫০ কিলোমিটার	অন্যান্য পেশায় যুক্ত	৪.৮৭%
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০১ টি	কৃষি ডিলার (বিসিআইসি)	১ জন

চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিচিতি ঃ

রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ৩নং ইউনিয়নটি চন্দনপাট ইউনিয়ন নামে পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী লাহিড়ীরহাট এই ইউনিয়নে অবস্থিত। রংপুর জেলা শহর (রংপুর বাস টার্মিনাল) হতে ১২ কিঃ মিঃ দক্ষিন পশ্চিমে চন্দনপাট ইউনিয়ন অবস্থিত। উত্তরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়ন, দক্ষিনে রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করিনী ইউনিয়ন, পূর্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং পশ্চিমে রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়ন এবং বদরগঞ্জ উপজেলার গোপলপুর ইউনিয়ন অবস্থিত। ইউনিয়ন এলাকার মাটি প্রধানত বেলে-দোঁআশ প্রকৃতির ইউনিয়নের পূর্ব পাশ দিয়ে ঘাঘট নদী প্রবাহিত।

যোগাযোগ		
ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫.০০ কিলোমিটার
০২	ইউনিয়ন পাকা রাস্তা	৩৯.৫০ কিলোমিটার
০৩	আধাপাকা রাস্তা (HBB/সলিং)	৮.৫০ কিলোমিটার
০৪	কাঁচা রাস্তা	৫৫ কিলোমিটার
০৫	ইউড্রেন	৫৫ টি
০৬	কালভার্ট/ব্রীজ	২৭ টি
০৭	প্যালাসাইড/গাইডওয়াল	৯ টি
০৮	রেল স্টেশন	০০
০৯	বাসস্ট্যান্ড	১ টি

গ্রামের নাম, ভোটার সংখ্যা, জনসংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য

ক্রমিক	গ্রামের নাম	ভোটার সংখ্যা		মোট	জনসংখ্যা	গ্রামের সম্পদের বর্ণনা
		পুরুষ	মহিলা			
০১	সাহাবাজপুর	১৯৭৬	১৯৪৯	৩৯২৫	৪৯৯৮	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৪ টি, উচ্চ বিদ্যালয়-০১টি, মহিলা কলেজ- ০১টি, মসজিদ- ০৭, মন্দির- ০৮টি, কমিউনিটি ক্লিনিক- ০১টি, প্রধান পেশাঃ কৃষি/ব্যবসা।
০২	ঈশ্বরপুর	২৭০৯	২৭৩৮	৫৪৪৭	৬৯৪১	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১ টি, উচ্চ বিদ্যালয়-০০ টি, মসজিদ-১০টি, মন্দির-০১ টি, প্রধান পেশাঃ কৃষি।
০৩	হরিপুর	৮১৭	৮২৫	১৬৪২	১৭৫২	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১ টি, মসজিদ-০৪ টি, মন্দির-০১টি, প্রধান পেশাঃ কৃষি/ব্যবসা।
০৪	বৈকুণ্ঠপুর	১২২৬	১২২৯	২৪৫৫	২৪৫০	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০২ টি, মসজিদ-০৭ টি, মন্দির-০১টি, প্রধান পেশা ঃ কৃষি/ব্যবসা।
০৫	শ্যামপুর	১৫২৮	১৬৩২	৩১৬০	৫১৮৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০২টি, মসজিদ-০৬ টি, প্রধান পেশা ঃ কৃষি/ব্যবসা।
০৬	অযোধ্যাপুর	৭৪৯	৬৫৯	১৪০৮	১৭৫২	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১ টি, মসজিদ-০২ টি, মন্দির-০২ টি, প্রধান পেশা ঃ কৃষি।
০৭	যাদবপুর	৫৪৭	৪৫৯	১০০৬	১৪৯৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১টি, মসজিদ-০২,মন্দির-০৩ টি, প্রধান পেশা ঃ কৃষি/ব্যবসা।
০৮	উমাপুর	২৯৯	৩১০	৬০৯	৭৬৯	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১ টি , মসজিদ-০২ টি, প্রধান পেশা ঃ কৃষি।
০৯	শ্রীরামপুর	৮৮২	৮৪৮	১৭৩০	২৩৬৮	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১টি, মসজিদ-০৭ টি। প্রধান পেশা ঃ কৃষি/ব্যবসা।
১০	চন্দনপাট	১৭৪৫	১৭২৬	৩৪৭১	৪৮৬১	প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৩ টি, মসজিদ-০৮, মন্দির-০৪ টি, প্রধান পেশা- কৃষি/ব্যবসা।
সর্বমোট		১২৪৭৮	১২৩৭৫	২৪৮৫৩	৩২৫৬৯	

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন এর মানচিত্র
রংপুর সদর, রংপুর

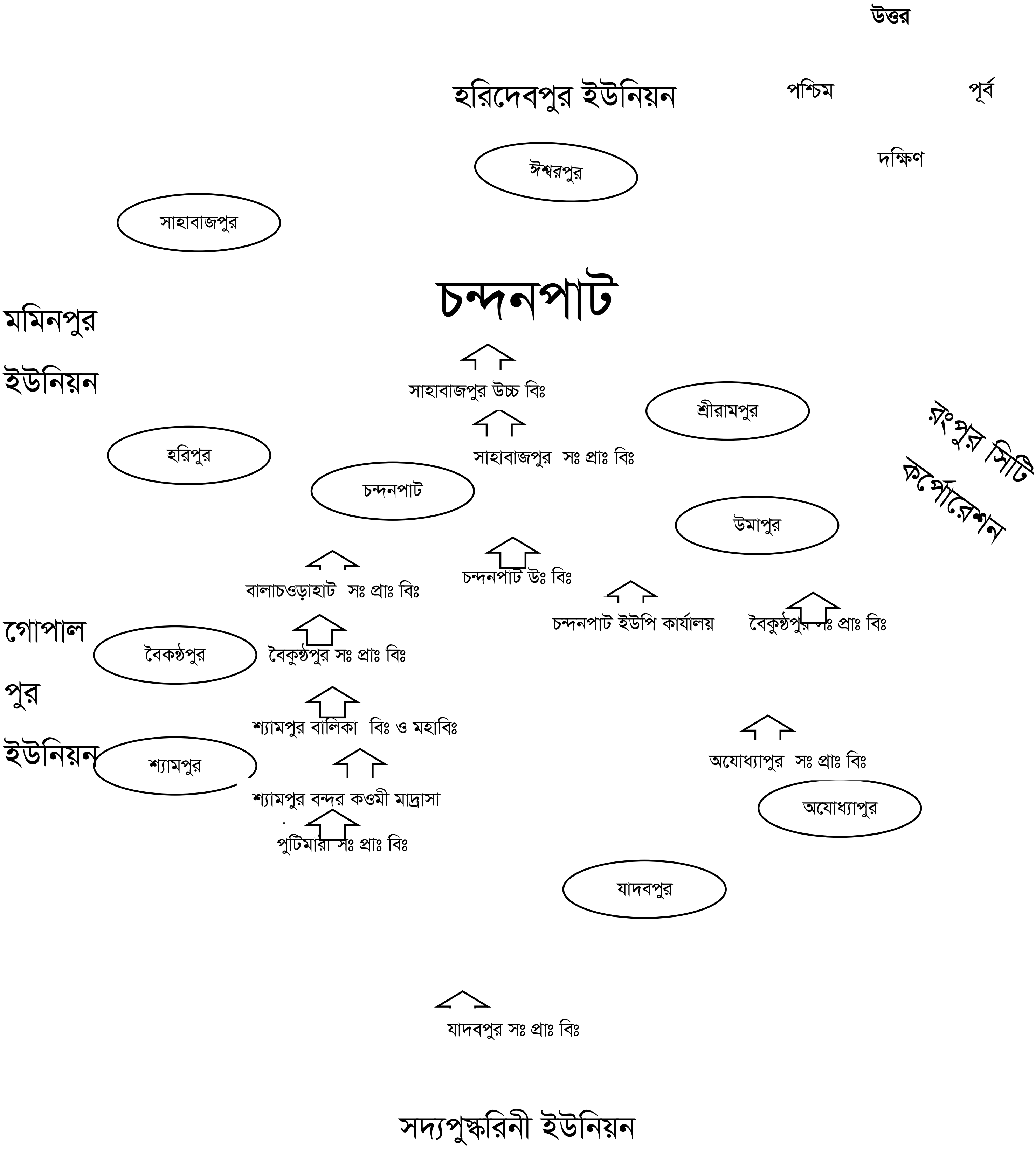

মানচিত্র (৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন)

চন্দনপাট ইউনিয়নের ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ

নামকরণঃ

আনুমানিক বার শত বছর পূর্বে পাল বংশ এবং সেন বংশের মধ্যে এই এলাকায় যে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল সেই সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী ছিল তাহারা যে বাহিনি যে এলাকায় অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সেই সৈন্য বাহিনির প্রধানের নাম অনুসারে সংশ্লিষ্ট এলাকার নামকরণ করা হয়েছিল। এখানে পাল বংশের সেনাপতির নামানুশারে এই ইউনিয়নের নামকরণ করা হয় চন্দনপাট।

ভৌগলিক অবস্থানঃ

রংপুর জেলা শহর থেকে ১২ কিঃ মিঃ দক্ষিন পশ্চিমে চন্দনপাট ইউনিয়ন অবস্থিত। উত্তরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়ন, দক্ষিণে রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করিনী ইউনিয়ন, পূর্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং পশ্চিমে রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়ন এবং বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়ন অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিবরণীঃ

ইউনিয়ন এলাকার মাটি প্রধানত বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির। ইউনিয়নের পূর্ব পাশ দিয়ে ঘাগট নদী প্রবাহিত। ইউনিয়নে চাপড়ার বিল, লাহিড়ীরহাট পুকুর নামে ২টি বিল আছে। এ অঞ্চলের প্রধান ফসল -ধান, পাট, গম, আলু, ভুট্টা ও আখ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন চন্দনপাটঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৭ মে ,১৯৭১ সালে নেকারপাড়া দেওডোবা বর্তমানে প্রেসিডেন্টের মোড় এলাকায় সেখানকার লোকজন আরবী ১২ রবিউল আউয়াল মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ-ই মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছিল। মিলাদ মাহফিলের সিন্নি রান্না করার সময় পাক হানাদার বাহিনি সেখানকার ৩২ জন নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে এসে লাহিড়ীরহাট পুকুরের (লাহিড়ীরহাট বধ্যভূমি) দক্ষিন এবং পশ্চিম পাড়ে দাড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। তারপর থেকে প্রায়শই এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিকামী মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ১৯৭২ সালে লাহিড়ীহাট বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মরনে স্থানীয় ছাত্র-যুবদের উদ্যোগে একটি একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল যাহা ২০১৮ ইং সালে সরকারী উদ্যোগে সংস্কার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চুড়ান্তরুপ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। কৃষক শ্রমিক, ছাত্র শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ রংপুর সেনা নিবাস ঘেরাও এ চন্দনপাট ইউনিয়নের হাজারো মানুষ দেশীয় অস্ত্র হাতে যোগ দিয়েছিল। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হটাৎ খান সেনারা দিনের বেলায় দেড় হালিয়া আক্রমন করে। প্রানের ভয়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে পালাইতে থাকে । চন্দনপাট ইউনিয়নের কতিপয় রাজনৈতিক কর্মী মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। দিয়েছেন পরামর্শ ও নির্দেশনা । যোগাযোগ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও কেন্দ্রিয় কমান্ডের সাথে। সেতু বন্ধন তৈরী করেছিলেন উভয়ের মাঝে। অনেকে সেদিন প্রান হারিয়েছেন। তারা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। সম্মুখ সমরে সক্রিয় অংশ গ্রহন করে যারা অস্ত্রহাতে লড়াই করেছেন তারা মুক্তিযোদ্ধা । আর মুক্তিযোদ্ধাকে খাবার দিয়ে, আশ্রয়দিয়ে, শত্রূদের খবরাখবর জানিয়ে যারা সহযোগতিা করেছে তারা সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা।

চন্দনপাট ইউনিয়নের অনেক মানুষ ১৯৭১ সালের ২৮মার্চ লাঠি ও দেশীয় হাতিয়ার নিয়ে ক্যান্টমেন্ট ঘেরাও অংশ গ্রহন করেছিলেন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ১৮ জন, মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ জীবিত আছেন কেউ মৃত্যু বরণ করেছেন। নিচে নাম দেওয়া হলঃ

৭.২ চন্দনপাট ইউনিয়নে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকা

ক্রঃ নং	ইউনিয়ন	গেজেট নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম
১	চন্দনপাট	গেজেট নং-২৪	শ্রী সুধারাম বর্মন	মৃত শশীরাম বর্মন	চন্দনপাট
২	চন্দনপাট	গেজেট নং-২৫	শ্রী বাবুরাম বর্মন	মৃত বসন্ত কুমার বর্মন	চন্দনপাট
৩	চন্দনপাট	গেজেট নং-১৩০	শ্রী শম্ভু চন্দ্র বর্মন	মৃত রাজ চন্দ্র বর্মন	চন্দনপাট
৪	চন্দনপাট	গেজেট নং-২১৮	শ্রী মনোরঞ্জন রায়	মৃত রাধা বল্লব রায়	চন্দনপাট
৫	চন্দনপাট	বিঃ গেজেট নং-১১৩৩৭	নায়েক জয়নাল আবেদীন	আঃ কাদের	বৈকুণ্ঠপুর
৬	চন্দনপাট	গেজেট নং- ২৮	মোঃ মমতাজুর রহমান	মৃত আজিজার রহমান	বৈকুণ্ঠপুর
৭	চন্দনপাট	গেজেট নং-২৬৮	মোঃ ওছমান গনি	মৃত ছদেল উদ্দিন	শ্রীরামপুর
৮	চন্দনপাট	গেজেট নং-৩০১	শফিউল আলম	মৃত আবাস উদ্দিন	শ্রীরামপুর
৯	চন্দনপাট	গেজেট নং-২৯	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত বাসার উদ্দিন	শ্রীরামপুর
১০	চন্দনপাট	গেজেট নং-১১৯	ডাঃ মোঃ গোলাপ হোসেন	মোঃ আব্দুর রহমান	পুটিমারী
১১	চন্দনপাট	গেজেট নং-১৩১	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত মছির উদ্দিন	খল্লাপাড়া
১২	চন্দনপাট	গেজেট নং-১৩৩	আব্দুল হামিদ (মানিক)	মৃত আঃ রহমান	উমাপুর
১৩	চন্দনপাট	গেজেট নং-১৬৫	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত আফান উদ্দিন	কলেজপাড়া
১৪	চন্দনপাট	গেজেট নং-২৩৩	শ্রী কংকন সরকার	মৃত যতিন্দ্র নাথ সরকার	শাহাবাজপুর
১৫	চন্দনপাট	গেজেট নং-২৯৫	শ্রী বলরাম মোহন্ত	মৃত উমা চরণ মোহন্ত	শাহাবাজপুর
১৬	চন্দনপাট	বিঃ গেজেট নং-২২৪১	সিপাহী রিয়াজুল হক	আহম্মদ আলী	সালমারা
১৭	চন্দনপাট	গেজেট নং-৮৯	শ্রী রবি মোহন্ত	শ্রী কেরু মোহন্ত	অযোধ্যাপুর
১৮	চন্দনপাট	গেজেট নং-৯০	মোঃ মনসুর আলী	মৃত পঁচা মন্ডল	কিসমত বসন্তপুর

রংপুর সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ও 'বঙ্গবন্ধু'র মুর‍্যাল (লাহিড়ীরহাট)ঃ

রংপুর জেলাধীন রংপুর সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ২০১৮ ইং সালে। কমপ্লেক্সের জমির পরিমাণ নয় শতাংশ। রংপুর সদর উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন জনাব আলহাজ্ব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী , মুক্তিযদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। কমপ্লেক্স ভবনটি চার তলা বিশিষ্ট আধুনিক সব সুবিধা সম্বলিত। এটিতে কনফারেন্স রুম, গেষ্ট রুম এবং নিচতলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার মত উপযোগী।

চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদঃ

ভূমিকা ঃ ছোট-বড় ১০টি গ্রাম অধ্যুষিত রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন। এর প্রতিটি প্রান্তই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন, গ্রামে গ্রামে অবারিত সবুজ মাঠ, ফুল-ফলে শোভিত বন-বিথিকা, রাস্তায় রাস্তায় নারকেল গাছের এলোকেশী শোভা, করতোয়া নদী তীর কাশফুলে ভরা, শাপলা-শালুকের বিল নীল দরিয়া, চাপুনদহ ও হরিণ শিং দিঘীর হংস মিথুন, সাঁওতালদের কুটির ঘেরা পল্লী, শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র সত্যিই অপূর্ব, আধ্যাতিক সাধক শাহ্ ইসমাইল গাজীর ঐতিহাসিক চতরা।

অবস্থান ঃ রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন ৩নং ইউনিয়নটি চন্দনপাট ইউনিয়ন নামে পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী লাহিড়ীরহাট এই ইউনিয়নে অবস্থিত। রংপুর জেলা শহর (রংপুর বাস টার্মিনাল) হতে ১২ কিঃ মিঃ দক্ষিন পশ্চিমে চন্দনপাট ইউনিয়ন অবস্থিত। উত্তরে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়ন, দক্ষিনে রংপুর সদর উপজেলার সদ্যপুস্করিনী ইউনিয়ন, পূর্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং পশ্চিমে রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়ন এবং বদরগঞ্জ উপজেলার গোপলপুর ইউনিয়ন অবস্থিত। ইউনিয়ন এলাকার মাটি প্রধানত বেলে-দোঁআশ প্রকৃতির ইউনিয়নের পূর্ব পাশ দিয়ে ঘাঘট নদী প্রবাহিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যানগণের নামের তালিকা ও কার্যকাল

উপজেলা- রংপুর সদর

জেলা- রংপুর।

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	মন্তব্য
০১	জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন (পাটোঃ)	১৯৫৬-৫৭ইং	
০২	জনাব মোঃ কছিম উদ্দিন	১৯৫৭-৫৯ইং	
০৩	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন চৌঃ	১৯৫৯-৬৫ইং	
০৪	জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন চৌঃ	১৯৬৫-৭১ইং	
০৫	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইউ,এ	১৯৭১-৭৪ইং	প্রশাসক
০৬	জনাব মোঃ মজিবর রহমান (১)	১৯৭৪-৭৭ইং	
০৭	জনাব মোঃ মজিবর রহমান (২)	১৯৭৭-৮৪ইং	
০৮	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন চৌঃ	১৯৮৪-৮৮ইং	
০৯	জনাব মোঃ মজিবর রহমান (১)	১৯৮৮-৯২ইং	
১০	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন চৌঃ	১৯৯২-৯৭ইং	
১১	জনাব মোঃ মজিবর রহমান (১)	১৯৯৮-২০০৩ইং	
১২	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌঃ	২০০৩-২০১৫ইং	
১৩	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	১৯১৫-২০২০ইং	

	মোঃ আমিনুর রহমান (চেয়ারম্যান)	
মোছাঃ রত্না পারভীন (মহিলা সদস্য,১,২ ও ৩)	মোছাঃ রহিমা বেগম (মহিলা সদস্য, ৪,৫ ও ৬)	শ্রীমতি ছায়া রানী (মহিলা সদস্য,৭,৮ ও ৯)
সৃজয় সরকার (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-১)	মোঃ আব্দুর রউফ প্রামানিক দুলাল (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-২)	মোঃ তাজুল ইসলাম (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৩)
মোঃ রফিকুল ইসলাম (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৪)	মোঃ নওয়াব আলী (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৫)	মোঃ রাকিবুল ইসলাম (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৬)
মোঃ ওয়ারেছ আলী (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৭)	মোঃ ফরহাদ হোসেন (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৮)	মোঃ মাজেদুল ইসলাম (ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড-৯)

বর্তমান ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদঃ

ইউনিয়ন পরিষদের জনবল পরিচিতি

	মোঃ মোকছেদুর রহমান ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	**সাধন চন্দ্র সরকার** হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
মোছাঃ আরিফা আক্তার (পরিচালক ,ইউডিসি)	**মোঃ মাহাবুব হোসেন** (পরিচালক , ইউডিসি)	**মোঃ হারুনুর রশিদ** দাফাদার
মোঃ আমজাদ হোসেন (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-১)	**মোছাঃ ফাতেমা বেগম** (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-২)	**মোঃ সুলতান বাদশা** (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-৩)
মোঃ ওবায়দুল হক (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-৪)	**মোঃ তারাজুল ইসলাম** (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-৫)	**মোঃ মজিবুল ইসলাম** (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-৬)
শ্রী সচিন চন্দ্র রায় (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-৭)	**মোঃ নয়ন মিয়া** (মহল্লাদার , ওয়ার্ড-৮)	**মোঃ সোহেল রানা** (মহল্লাদার ,ওয়ার্ড-৯)

শান্তি নিরাপত্তায় চন্দনপাট :

ছবি: গ্রামপুলিশ বাহিনী।

ইউনিয়নের শান্তি, নিরাপত্তা ও অভ্যান্তরীন গোলযোগ রক্ষার জন্য প্রধানত গ্রাম পুলিশ নিয়োজিত আছে। রাতের বেলায় ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় নৈশপ্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্যামপুর টু নজীরেরহাট গামী রাস্তা এবং লাহিড়ীর টু শ্যামপুরগামী রাস্তার ছিরামাল্লির দোলা ও চাপড়ার দোলায় টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনিয়নে আইন শৃংখলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিট পুলিশের সহযোগীতায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেনীপেশার লোকজনকে পুলিশিং কমিটির অর্ন্তভূক্ত করে ইউনিয়নের ঝগড়া - ফ্যাসাদ ইভটিজিং, বাল্য বিবাহরোধ,মাদক সেবন, চুরি-চামারি, জুয়া খেলা বন্ধসহ বিবিধ প্রকার অন্যায় কাজের প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতি পূর্বেকার অন্যায় আচরনের তালিকাভূক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে সংশোধনের এবং সুষ্ঠ্য সুন্দর নির্দোষ জীবন যাপনের জন্য জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাকরন, পুরস্কার প্রদান করে ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে । এই ধরনের কার্যক্রম আগামীতে ও চলমান থাকবে । ফলে বাড়ীচুরি, গরুচুরি, জুয়াখেলা, ইভটিজিংসহ বাল্য বিবাহ বন্ধ হয়েছে। এগুলোর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে চন্দনপাট ইউনিয়নের জনগন।

চন্দনপাট ইউনিয়নের বিচার ব্যবস্থা :

ছবি: ইউনিয়নের গ্রাম আদালত বিচার মূহুর্ত

পারস্পরিক ভূলবোঝাবুঝি ও নিজস্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘঠিত অপরাধ সমুহ ওর্য়াডের নির্বাচিত সদস্য ও গন্যমন্য ব্যক্তির মধ্যস্থতায় শালিসের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। সম্ভাবনা না হলে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও নাগরিক উদ্যোগ, ব্র্যাক শালিস কেন্দ্র বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমেও বিবাদমান সমস্যার সমাধান করা হয়। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিবাদমান পক্ষের বিবাদের সুষ্ঠু সমাধান করে আগামীতে মিল মহব্বতের সাথে সমাজে সহঅবস্থানে বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা। কোন ভাবেই যেন মানুষ কোর্টকাচারীতে মামলার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তার চেষ্টা করা।

চন্দনপাট ইউনিয়নের হাট-বাজার সমুহঃ

হাট-বাজার ও অন্যান্য		
ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	হাট/ইজারা ভুক্ত হাট	০৫ টি
০২	স্থানীয় সৃষ্ঠ বাজার	০৪ টি
০৩	হিমাগার	০১ টি
০৪	ফিলিং স্টেশন	০১ টি
০৫	ইটভাটা	০৯ টি

চন্দনপাট ইউনিয়নের হাট-বাজার :

হাট-বাজার কোন অঞ্চলের সমৃদ্ধি, রুচি, বানিজ্য ও স্বালম্বীর পরিচায়ক। বাজার হাটের দোকানে ঐ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজন মাফিক দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়। ঐ সবসামগ্রীর মান অনুযায়ী ঐ অঞ্চলের মানুষের রুচি বোধ জানা যায়। হট-বাজারের লেনদেন ব্যবসা অনুপাতে ঐ অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক সচ্ছলতা সম্পর্কে বুঝতেপারা যায়। অত্র হরিদেবপুর ইউনিয়নে একটি বন্দর একটি ছোট মার্কেট সহ আরও চারটি হাট বাজার রহিয়াছে। এলাকাবাসী শহরের প্রয়োজন ছাড়া দৈনন্দিনের সকল প্রয়োজন এই হাট-বাজার ও বন্দর থেকেই পূরন করেন ।

ঐতিহ্যবাহী লাহিড়ীরহাটঃ

লাহিড়ীরহাট চন্দনপাট ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন হাট ও বাজার। চন্দনপাট ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের সাহাবাজপুর নামক মৌজায় এই হাট-বাজারটি অবস্থিত। রংপুর কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল হতে প্রায় ১০.০০ কি.মি.দুরে বদরগঞ্জগামী রাস্তার উপড়ে হাট-বাজারটি অবস্থিত। এই বাজারটির দক্ষিন পাশে ঐতিহাসিক লাহিড়ীরহাট বধ্যভুমি। বাজারটির পাশে সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। বাজারটির পশ্চিম পাশে মহিলা কলেজ লাহিড়ীরহাট অবস্থিত। বাজারটির প্রবেশদ্বারে দুইজন বুজর্গের নামে তৈরীকৃত দুই পীরের মাজার নামে একটি মাজার শরীফ ইয়াতীমখানা ও হেপযখানা মাদ্রাসা অবস্থিত। সপ্তাহে দুইদিন রবিবার ও বৃহস্পতি এই হাট বসে। এই হাট শুরু হয় দুপুরের পর আর সন্ধার রাত্রীতে হাট শেষ হয়। গৃহস্থালীর এমন কোন কিছুই বাদ নাই যা এ হাটে পাওয়া যায় না। অনেক দুরদুরান্ত কয়েক জেলার লোকজন এখানে ব্যবসার জন্য আসেন।

ছবি: লাহিড়ীর হাট

মাটিয়াপাড়া হাটঃ

ছবিঃ মাটিয়াপাড়া হাট

ইউনিয়ন পরিষদের পাশে মাটিয়াপাড়া হাট, সপ্তাহে দুইদিন রবিবার ও বুধবার এই হাট বসে। এই হাট শুরু হয় দুপুরের পর আর সন্ধার রাত্রীতে হাট শেষ হয়। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সবকিছুই এই হাটে পাওয়া যায় ।

মাঠের হাটঃ

ছবি: মাঠের হাট

ইউনিয়ন পাগলপীর রোডের দক্ষিনদিকে প্রায় ১কিলোমিটার দূরে মাঠেরহাট, সপ্তাহে দুইদিন শনিবার ও মঙ্গলবার এই হাট বসে। এই হাট শুরু হয় দুপুরের পর আর রাত্রীতে হাট শেষ হয়। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাচাবাজার ও মাছ মাংস পাওয়া যায়।

বালাচওড়ার হাটঃ

ছবি:বালাচওড়ার হাট

চন্দনপাট ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের হরিপুর নামক মৌজায় বালাচওড়া হাট-বাজারটি অবস্থিত। সপ্তাহে দুইদিন শুক্রবার ও মঙ্গলবার এই হাট বসে। এই হাট শুরু হয় দুপুরের পর আর রাত্রীতে হাট শেষ হয়।

বাবুর হাটঃ

ছবি: বাবুর হাট

ইউনিয়ন পূর্ব দক্ষিনদিকে প্রায় ১কিলোমিটার দূরে বাবুর হাট, সপ্তাহে দুইদিন বৃস্পতিবার ও রবিবার এই হাট বসে। এই হাট শুরু হয় দুপুরের পর আর রাত্রীতে হাট শেষ হয়। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাচাবাজার ও মাছ মাংস পাওয়া যায়।

শ্যামপুর বন্দরঃ

ছবি: শ্যামপুর বন্দর

শ্যামপুর বন্দর চন্দনপাট ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় বাজার। চন্দনপাট ইউনিয়নের ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের শ্যামপুর মৌজায় এই বাজারটি অবস্থিত। রংপুর কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল হতে প্রায় ১৪.০০ কি.মি.দুরে শ্যামপুরগামী রাস্তার উপড়ে বাজারটি অবস্থিত। এই বাজারটির উত্তর-পশ্চিম পাশে শ্যামপুর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শ্যামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় অবস্থিত। সপ্তাহের প্রতিদিন বাজার বসে। এই বাজার শুরু হয় সকাল বেলা আর সন্ধার রাত্রীতে বাজার শেষ হয়। গৃহস্থালীর এমন কোন কিছুই বাদ নাই যা এ বাজারে পাওয়া যায় না।

সাফল্যগাথাঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনীঃ

বীর মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ডাঃ মোঃ গোলাপ হোসেন (১৯৫৪-) ইং সাল

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ডাঃ মোঃ গোলাপ হোসেন চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভূক্ত পুটিমারী গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯৫৪ ইং সালে ১৫ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পুটিমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন শুরু করে পরবর্তীতে শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ০৩ টি বিষয়ে লেটার মার্ক সহ ১ম বিভাগে ১৯৭০ ইং সালে এস.এস.সি পাশ করেন। সেই সময়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক ও আন্তরিকতা ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মরহুম খয়ের উদ্দিন স্যারের পরামর্শে রংপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হন। তিনি বোর্ড ও কলেজের বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। রংপুর শহরের শালবন এলাকায় কালীধাম ছাত্রাবাসে (বর্তমান শহীদ মুসলিম উদ্দিন ছাত্রাবাস) থাকতেন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ১৯৭৩ ইং সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৩ ইং সালে রংপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানে ভর্তি হন। ১৯৮০ ইং সালে এম.বি.বি.এস পাশ করে সরকারি হাসপাতালে যোগদান করেন। ২/৩ মাস পর সেনাবাহিনীর আইএসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আবারো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সরাসরি ক্যাপ্টেন পদে এ.এম.সি কোরে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসর সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং ২০০৯ ইং সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে অধিনায়ক হিসেবে দক্ষতার সাথে চাকুরী করেন। তাছাড়াও জাতিসংঘ মিশনে কুয়েত ও আইভরিকোস্টে সেখানকার জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। তার পরিবারে স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রয়েছে।

তিনি তার পিতা মরহুম আব্দুর রহমান, মাতা মরহুম মোছাঃ গোলেজা খাতুন, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক মন্ডলীর অবদান স্বীকার করেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া কখনোই এ পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব ছিল না। তিনি শিক্ষা জীবনে শিক্ষকদেরকে চির জীবন গুরুজন ভাবেন এবং যারা জীবিত আছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জ্ঞাপন করেন।

তৎকালীন চিলাহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পাক সেনাদের ক্যাপ্টেন মেহেদীর নেতৃত্বে স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ ৬নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তিনি বিমান বাহিনীর একজন দক্ষ হেলিকপ্টার পাইলট ছিলেন। তার নেতৃত্বে চিলাহাটি থেকে ডোমার, ভাওলাগঞ্জ, টেপরীগঞ্জ, গোমনাতী ও আমবাড়িতে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে অগনিত ও গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করেন। অনেক সময় ডোমার থেকে চিলাহাটি রেললাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইতো। তার কমান্ডের অধিনস্ত ৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন অপারেশনে শাহাদাত বরণ করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং সালে চিলাহাটিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে গোলাগুলি শুরু হলে পাক সেনারা রাতের অন্ধকারে স্থান ত্যাগ করে এবং ঐ দিনই চিলাহাটি শত্রুমুক্ত এলাকা হিসাবে গণ্য হয়। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং সালে কিশোরগঞ্জ এলাকায় সম্মুক যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারির সহায়তায় পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুবাহিনীর আর্টিলারির গোলায় আহত হন। তার ডান কাঁধে একটি ক্ষতচিহ্ন এখনো বিদ্যমান। সেজন্য তিনি গর্ববোধ করেন।

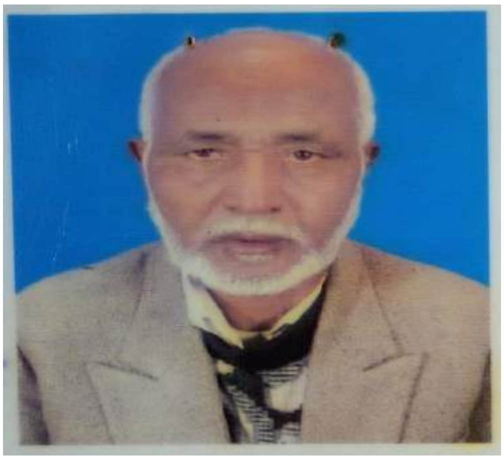

মোঃ মজিবর রহমান (১৯৫৩-২০১৭) ইং
সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, (তিনবার নির্বাচিত)

জন্মঃ ১ লা এপ্রিল, ১৯৫৩ খ্রিঃ
মৃত্যুঃ ৩০শে এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিঃ

রংপুর সদর উপজেলার চনন্দপাট ইউনিয়ানাধীন উমাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫৩ সালের ১ লা এপ্রিল, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ১৮ চৈত্র, তিনি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ কছিম উদ্দিন সরকার ও মাতা মোছাঃ জরিনা বেগম। স্বাধীনতা পূর্বকালে তাঁর পিতাও অত্র ইউনিয়নের একজন সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) ছিলেন।
চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনিই পিতা মাতার প্রথম সন্তান। লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় নিজ পিতার প্রতিস্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৭৩ সনে জাতীয়করণের পর থেকে যা অযোধ্যাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি তাঁর দাদার প্রতিস্ঠিত মক্তবে আরবি বিদ্যা চর্চা করেন।
প্রাথমিকের গন্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ভর্তি হন ঐতিহ্যবাহী শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই তিনি কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন ১৯৬৮ সালে।
পরে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য শহরে পাড়ি জমান। ভর্তি হন রংপুর সরকারি কলেজে এবং সাফল্যের সাথে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি বি.এ ডিগ্রী অর্জণ করেন। পেশাগত কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রংপুর টিসার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড কোর্স সম্পন্ন করেন ১৯৮৮ সনে।

পিতার জনপ্রিয়তার রেশ ধরে জনআকাঙ্খা পূরণে তরুণ প্রার্থী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে প্রথম নির্বাচন করেন ১৯৭৩ সনে এবং প্রথমবারই তিনি বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তরুণ চেয়ারম্যান হয়েও তিনি তার দায়িত্ব পালনে মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দেন এবং সফলতার সাথে মেয়াদ শেষ করেন।
এরপর তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন মহান পেশা শিক্ষকতাকে। সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৭৮ সনে যোগদান করেন চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। একই বিদ্যালয়ে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতী লাভ করেন ১৯৯২ সনে। সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে তিনি দক্ষতার সহিত তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। নিজ কর্মদক্ষতা, মেধা ও যোগ্যতার বলে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে। চাকুরী কালের শেষ অবধি সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অধিষ্ঠিত থেকে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

চাকুরীরত অবস্থায় বহুল জনপ্রিয়তার সুবাদে আরও দুইবার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় অর্জণ করেন। ন্যায়, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে তিনি তার সকল দায়িত্ব পালনে সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।
তার জনকল্যানমুলক কাজের নিদর্শণ সমুহ হলোঃ রাস্তা-ঘাট মেরামত, নতুন মসজিদ স্থাপন ও পুরোনো মসজিদ সংস্কার, মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং অনুদান প্রদান, মন্দির সংস্কার, বাধ নির্মাণ, ইদগাহ মাঠ সংস্কার, স্কুল-কলেজে অনুদান প্রদান, রাস্তা পাকা করণের ব্যাবস্থা, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন স্থাপন ও নির্মাণে সার্বিক সহোযোগীতা প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল, কল্যানকামী, সদা হাস্যজ্জল, সদালাপী একজন সজ্জন ব্যক্তি।

২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ এপ্রিল ৬৪ বছর বয়সে এই গুনি মানুষটি স্ত্রী, চার পুত্র ও তিন কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চিরতরে পাড়ি জমান অসীম ও অনন্তকালের জীবনে।

অলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৪২-২০২২) ইং সাল

সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (২০০৩-২০১৫) ইং সাল

আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম চৌধুরী চন্দনপাট ইউনিয়নের ঈশ্বরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৃত. পাশা সরকার, মাতা মৃত. ছালেহা বেগম। ছোট বেলায় তিনি বাবাকে হারান। শিক্ষা জীবনে তিনি এসএসসি পাশ করেন।

ছোটবেলা থেকেই রাজনীতিমনা ও অনন্য নেতৃত্বে গুণের অধিকারী ছিলেন। সততা, সত্যে নির্ভীক, নিঃস্বার্থ মানসিকতা, পরোপকারী, দানশীলতা, সহযোগিতাপূর্ণ ও আন্তরিকতার মানুষ ছিলেন। এলাকার দরিদ্র মানুষকে সীমাহীন ভাবে সাহায্য ও সযোগিতা করতেন। যেমনঃ– ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার সমস্যা, মেয়ের বিয়ে, আর্থিক সমস্যা, বাসস্থান ও কর্মের সমস্যা।

শিক্ষার জীবনে তিনি ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। লাহিড়ি হাট মহিলা কলেজ উহার মধ্যে একটি অন্যতম উদাহরণ। সেবা মূলক কাজে তিনি প্রচারনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এলাকার দরিদ্র মানুষকে সীমাহীন ভাবে সাহায্য ও সযোগিতা করতেন। এলাকার কোন পরিবারে কোন ধরনের সমস্যা এই ধরনের সেবা মূলক কাজ তিনি অতি আনন্দের সহিত করতেন। কর্ম জীবনে তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ি। তিনি অনেক কষ্ট করে তিলে তিলে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি হরিদেবপুর ইউনিয়নের পানবাজারে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এখানে এলাকার শত শত মহিলা ও পুরুষ কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তিনি ২০০৩ ইং সালে চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে একাধারে প্রায় ১২ বছর বছর সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তি জীবনে ০২ কন্যা ও ০৪ পুত্রের জনক আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম চৌধুরী ২০২২ ইং সালে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে অসংখ্য গুনগ্রাহীকে কাঁদিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ডাঃ পরিমল চন্দ্র সরকার (১৯৫৬-   ) ইং সাল

ডাঃ পরিমল চন্দ্র সরকার, পিতা-ভিকারী চন্দ্র সরকার, মাতা- খিরোদা বালা সরকার, গ্রামঃ সাহাবাজপুর, ডাকঃ লাহিড়ীরহাট. উপঃ রংপুর সদর, জেলাঃ রংপুর। তিনি ১৯৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শ্যামপুর উচ্চ বিদ্রারয় থেকে ১৯৭২ সালে এস.এস.সি পাশ করেন, কারমাইকেল কলেজ ও রংপুর থেকে ১৯৭৪ সালে এইচ.এস.সি পাশ করার পর তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস এ ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৮২ সালে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ ঢাকা থেকে এম.ফিল (মাইক্রেবায়োলজি) ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে থাইল্যান্ডের সিরিরাজ হসপিটাল, মহিডোল, ব্যাংকক থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন পরে তিনি মেডিকেল অফিসার হিসাবে পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরের পাড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগদান করেন সেখান থেকে পুনরায় রংপুর মেডিকেল কলেজে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। অতপরঃ মেডিকেল অফিসার হিসাবে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করেন সেখান থেকে ১৯৯৩ সালে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করার জন্য আইপিজিএমআর, ঢাকায় যান এবং সেখানে লেকচারার (মাইক্রোবায়োলজি) ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। পুনরায় রংপুর মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি) হিসাবে যোগদান করেন ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে সেখানেই ২০০৪ সালে পদোন্নতি পেয়ে সহযোগী অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি) হন এবং ২০০৭ সালে একই বিভাগে অধ্যাপক হয়ে ২০১৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি প্রাইম মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে অধ্যাপক হিমসাবে কর্মরত আছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১ ছেলে ও ১ মেয়ে সন্তানের জনক ২জনেই ডাঃ পেশায় আছেন।

প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাকিম (১৯৪৭-   ) ইং সাল,

প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাকিম, পিতা- মৃত. আবুল মসুদ (আবঃ ইন্সঃ), মাতা- মৃত. হালিমা বেগম, সাং-চন্দনপাট, ডাকঘর- চন্দনপাট, উপজেলা- রংপুর সদর, জেলা- রংপুর।

প্রফেসর মোঃ আব্দুল হাকিম ১৯৪৭ ইং সালে চন্দনপাট ইউনিয়নের চন্দনপাট গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি পরর্তিতে শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস এস সি), কারমাইকেল কলেজ হতে আই.এ (বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক) ও বি.এ (অনার্স) এবং এম.এ (অর্থনিতী) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ছোটবেলা থেকেই শিক্ষানুরাগী ও অনন্য নেতৃত্বে গুণের অধিকারী ছিলেন। সততা, সত্যে নির্ভীক, নিঃস্বার্থ মানসিকতা, পরোপকারী, দানশীলতা, সহযোগিতাপূর্ণ ও আন্তরিক মানুষ ছিলেন।

তিনি ১৯৭০ সালে প্রথম সরকারী বানিজ্য কলেজ, আগরাদা, চট্রগ্রাম এ অর্থনিতি বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তিতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে দিনাজপুর সরকারী কলেজ এ যোগদান করেন অতপর পর্যায়ক্রমে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কারমাইকেল কলেজ, রংপুর সহকারী অধ্যাপক পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, প্রফেসর বয়রা সরকারী মহিলা কলেজ, খুলনা বিভাগীয় প্রধান অর্থনিতি বিভাগ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর সর্বশেষ অধ্যক্ষ, এম.এম সরকারী কলেজ, পঞ্চগড় থেকে ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মোঃ সমসের আলী (১৯৪২-   )

———————————————————————

মোঃ সমসের আলী, পিতা- মৃত. মিজান উদ্দিন,মাতা- মৃত. আছিয়া খাতুন, সাং-চন্দনপাট, ডাকঘর- চন্দনপাট, উপজেলা- রংপুর সদর, জেলা- রংপুর। তিনি ১৯৪২ সালে চন্দনপাট ইউনিয়নের চন্দনপাট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রংপুর জিলা স্কুল থেকে ১৯৬৩ সালে মেট্রিকুলেশন (এস.এস.সি) পাশ করেন, কারমাইকেল কলেজ থেকে ১৯৬৫ সালে আই.এ পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজবিনের শুরুতে তিনি পঞ্চগড় কলেজে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন পরে নীলফামারী সরকারী কলেজে প্রভাষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সর্বশেষ কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে ১৯৯৯সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১ ছেলে ও ১ মেয়ে সন্তানের জনক।

মোঃ আব্দুল হামিদ (১৯৪৭-২০২৩)

মোঃ আব্দুল হামিদ, পিতা- মৃত. সামসুল আলম, মাতা- মৃত. হামিদা বেগম, সাং-চন্দনপাট, ডাকঘর- চন্দনপাট, উপজেলা- রংপুর সদর, জেলা- রংপুর। তিনি ১ আগষ্ট ১৯৪৭ খ্রিঃ চন্দনপাট গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার শিক্ষা জীবনের শুরু চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরবর্তিতে তিনি শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে মেট্রিকুলেশন (এস.এস.সি) পাশ করেন, রংপুর কলেজ (রংপুর সরকারী কলেজ) থেকে ১৯৬৬ সালে আই.এ পাশ করেন, রংপুর কলেজ (রংপুর সরকারী কলেজ) থেকে বি.এ পাশ করেন ১৯৬৯ সালে একই কলেজ থেকে বি.কম পাশ করেন ১৯৭২ সালে। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের অভিপ্রায়ে ১৯৭৫ সালে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেনীতে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৮০ সালে এম.এড ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই কলেজ থেকে ১৯৮১ সালে এম.এ কোর্স সম্পন্ন করেন। সর্বশেষ তিনি রংপুর আইন কলেজ থেকে এল.এল.বি ডিগ্রি অর্জন করেন। সামাজিক জীবনে তিনি চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়ের জমি দাতা চন্দনপাট সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি দাতা ও প্রতিষ্টাতা, চন্দনপাট সাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রের প্রতিষ্টাতা এবং চন্দনপাট ইউনিয়ন ভুমি অফিসের জমি দাতা। কর্মজীবনে তিনি চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সহকারি শিক্ষক ও ১৯৭৩ থেকে ২০০৭ সাল নিষ্ঠার সাথে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। রংপুর জেলা বেসরকারী শিক্ষক সমিতির ১৯৮২ হইতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ২০০৭ সালে। ২০২৩ সালে তিনি মৃত্যুবরন কনে।

শ্রী দীলিপ কুমার ব্যানার্জী (১৯৫৩-   ) ইং সাল

শ্রী দীলিপ কুমার ব্যানার্জী ১৯৫৩ ইং সালে চন্দনপাট ইউনিয়নের চন্দনপাট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা মৃত. অহিভূষন ব্যানার্জী এবং মাতা মৃত. অন্নপুন্যা।

শ্রী দীলিপ কুমার ব্যানার্জীর শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি গ্রামের চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে মেট্রিকুলেশন (এস.এস.সি) এবং রংপুর কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে আই.এ ও ১৯৬৮ সালে বি.এ পাশ করেন।

কর্মজীবন শুরু করেন তিনি ১৯৬৯ সালে আলমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে পরবর্তিতে নিজ ইউনিয়ন চন্দনপাটের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের মধ্যদয়ে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরীরত অবস্থায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাান সমিতি, রংপুর সদর উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমনের সময় তিনি অগ্রনী ভুমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সোনালিকা নাট্য সংসদের নাট্য সম্পাদক এবং বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর নিয়মিত বেতার নাট্যকার। দীর্ঘ্য কর্মজীবনে তাহার হতে তৈরী অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন দপ্তরে কর্মরত আছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ কন্যা সন্তানের জনক।

এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল হক প্রামানিক (১৯৫৭-   )
——————————————————————————————

এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল হক প্রামানিক, পিতা- মৃত একেএম তফেল উদ্দিন প্রামানিক,মাতা- মৃত রওশনা বেগম, সাং-ঈশ্বরপুর, ডাকঘর- লাহিড়ীরহাট, উপজেলা- রংপুর সদর, জেলা- রংপুর। তিনি ১৯৫৭ সালে চন্দনপাট ইউনিয়নের ঈশ্বরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হরিদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর, থেকে ১৯৭৩ সালে মেট্রিকুলেশন (এস.এস.সি) পাশ করেন, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর থেকে ১৯৭৫ সালে এইচ এস সি পাশ করেন, রংপুর কলেজ, রংপুর থেকে (১৯৭৮) সালে বিএ(পাশ) করেন এবং ঢাকা সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি কলেজ, ঢাকা থেকে ১৯৮০ সালে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৮২ সালে এ্যাডভোকেট হিসাবে যোগদান করেন। তিনি বার এসোসিয়েশনে ১ম সেক্রেটারি (২০১৪-২০২৩) কর্মরত আছেন। এসবের পাশাপাশি তিনি একজন সমাজ সেবক।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ মেয়ে সন্তানের জনক।

অধ্যাপক ডাঃ হৃদয় রঞ্জন রায় (১৯৬৯-   ) ইং সাল

অধ্যাপক ডাঃ হৃদয় রঞ্জন রায়, পিতা- মৃত সুধীর কুমার রায়, মাতা- মৃত রেনুকা রায়,গ্রামঃ যাদবপুর, ডাকঃ চন্দনপাট. উপঃ রংপুর সদর, জেলাঃ রংপুর। তিনি ১লা জুন, ১৯৬৯ খ্রিঃ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শ্যামপুর উচ্চ বিদ্রারয় থেকে ১৯৮৪ সালে এস.এস.সি পাশ করেন, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর থেকে ১৯৮৬ সালে এইচ.এস.সি পাশ করার পর তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস এ ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৯৩ সালে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে আমেরিকা, শিকাগো থেকে এফএসিএস, এফআইসিএস উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

শিক্ষাজীবন শেষে ২০০১ সালে ২০তম বিসিএস দিয়ে এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য) হিসাবে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যোগদান করেছেন। তিনি এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (সার্জারী), এফএসিএস(আমেরিকা), এফআইসিএস (শিকাগো), অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর। জেনারেল ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন এবং সার্জারী বিশেষজ্ঞ। এসবের পাশাপাশি তিনি একজন সমাজ সেবক।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ ছেলে সন্তানের জনক।

মোছাঃ আসমা বেগম

সফল নারী উদ্যোক্তা

মোছাঃ আছমা বেগম, পিতাঃ মৃত আবুজার রহমান, মাতাঃ মোছাঃ রুপালী বেগম, স্বামীঃ মৃত গোলাম মোস্তফা,গ্রামঃ শ্যামপুর পুটিমারী, ডাকঃ শ্যামপুর , উপজেলাঃ রংপুর সদর, জেলাঃ রংপুর।

ছোটবেলা থেকেই উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিলো। তিনি সত্যে নির্ভীক, নিঃস্বার্থ মানসিকতা, সহযোগিতাপূর্ণ ও আন্তরিকতার মানুষ ছিলেন। ২০১৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করেন। পরবর্তীতে অনেক কষ্টে ধার দেনা করে নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে তিনি মাছ চাষে সফলতা পান। অতঃপর মাছ চাষের মাধ্যমে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে ৪টি গাভী ক্রয় করে স্বল্প পরিসরে খামার কার্যক্রম শুরু করেন। এখন তাহার খামারে উৎপাদিত দুধ প্যাকেটজাত করে বাজারজাত কার্যক্রম শুরু করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে সন্তানের জনক। তার এক ছেলেকে তিনি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং করার জন্য সুদুর চীন দেশে পাঠিয়েছেন। আর এক ছেলেকে দেশেই পড়াশুনা করাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে এলাকায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন।

কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্পের বর্ননাঃ

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেডঃ

ঢাকার শুক্রবারের একটা দোকানের নাম শতরঞ্জি এখানে রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি পাওয়া যায়। নান্দনিক অন্দরসাজে বাংলাদেশের নিজস্ব কার্পেট । এই শতরঞ্জি বেশ কয়েক বছর হলো বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। এই শতরঞ্জি দোকানের পেছনে আছে কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠান। আর সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন মোঃ সফিকুল আলম সেলিম। তিনি শতরঞ্জিকে ছরিয়ে দিয়েছেন বহিঃবিশ্বে। শফিকুল আলম সেলিমের গল্পটা শুরু হয়েছিল ১৯৮৬ সালে গম গাছের খড় দিয়ে দেরহাজার ছবি বানিয়ে ঢাকা শিল্প মেলায় একটি স্টল দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ছবি বিক্রি হয় নাই্ ছবিগুলো ছিল দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিসহ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। তিনি হতাশ হয়ে পরলেন। এরপর তিনি স্টলে ঝুলিয়ে দিলেন "আপনি কি আপনার ছবি গমের খড় দিয়ে বানাতে চান?" এর পর অর্ডার আসতে থাকে প্রতিদিন গড়ে দশটি করে ছবি বা নাতে থাকেন। এর পর তিনি উৎসাহিত হয়ে চলে আসেন রংপুরে।

১৯৮৭ সালে ছাত্ররাজনীতির কারনে তিনি গ্রেফতার হয়ে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত অনেক কয়েদী হস্তশিল্পের বুননের কাজ করেন। তাদের তাঁতচাষী বলা হয়। এই তাঁতচাষীদের কাজ তিনি তিন মাস দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখেছেন। জেল থেকে রেরিয়ে তিনি সেই বুননের কাজে ঝুকে পড়েন।

সফিকুল আলমের বাবা এমএ সোবহান ছিলেন রাজনীতিবীদ। বাবার কারনে তিনিও ছোটবেলা থেকে ছাত্ররাজনীতিতে জরিয়ে পড়েন। ছাত্রজীবনে নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৯১ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) পাস করেন।

১৯৯১ সালেই রংপুরে কারুপণ্য নামের একটি দোকান দিয়ে "শতরঞ্জি" বুননের কাজ শুরু করেন। জাগিয়ে তুললেন শতরঞ্জি যে, শতরঞ্জি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল সেই শতরঞ্জি এখন ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।
শতরঞ্জি শিল্পের ২০ জন কারিগরকে খুজে বের করেন। সেই পুরোনো কারিগরদের খুজে বের করে নতুনদের প্রশিক্ষিত করে শতরঞ্জি বুননের কাজ শুরু করেন। এত সামান্য আয় হয়। তিনি এখানেই থেমে না থেকে শতরঞ্জি বিক্রির জন্য ব্যপক প্রচারনায় নামেন। প্রচারনার অংশ হিসেবে বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা শুরু করেন। এরপর স্বল্প পরিসরে চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর মৌজার লাহিড়ীরহাট বাজারের পার্শবতি রংপুর-বদরগঞ্জ রোডের ধারে কারখানা স্থাপন করে এই কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড এর যাত্রা শুরু করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ১৫০০ মহিলা কর্মী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

ইকো-ক্রেভ লিমিটেডঃ

Eco crave লিমিটেড একটি কারুপণ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ২০২১ সালে চন্দনপাট ইউনিয়াধীন লাহিড়ীরহাট বাজারের একটি পরিত্যক্ত মুরগীর খামার ঘরে। প্রতিষ্ঠানটি শুরুতে ৮ জন হস্তশিল্প কারিগর নিয়ে যাত্র শুরু করেন। পরবর্তিতে প্রতিষ্ঠানটি আরো একটি নতুন সেকশন তৈরী করে যার নাম "হ্যান্ডলুম সেকশন" যেখানে পাপসসহ বিভিন্ন প্রকার পাটজাত পণ্য। Eco crave প্রতিষ্ঠানটিতে অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হতদরিদ্র পরিবারের নারীরা এখানে হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেছে। এই হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে পাপসসহ পাটজাত বিভিন্ন প্রকার পণ্য প্রস্তুত পূর্বক দেশের ভিতরে জেলায় এবং দেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে প্রায় ২৫০ জন নারী কর্মী কাজ করেন।

মনছুরা জুট হ্যান্ডিক্রাফটঃ

মনছুরা জুট হ্যান্ডি ক্রাফট এর সত্বাধিকারীর কাছে তার এই প্রতিষ্ঠানের উত্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, তার বয়স যখন কুড়ি বছর তখন প্রেমের সম্পর্কের সুত্র ধরে বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তি গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে। তাহার শ্বশুর এবং শ্বাশুরী আগে থেকেই নিজ বাড়িতে পাটের তৈরী পাপসসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরী করে আরডিআরএস, রংপুর এর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করতেন। বিয়ের পর তিনি তাদের এই কার্যক্রম দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে এই কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে একটা একজন ক্রেতা পেলেন তিনি অর্ডার করেছিলেন ৮৫০০০.০০ (পচাশি হাজার) টাকা। ক্রেতা অ্যাডভান্স করেও কোন অদৃশ্য কারনে পণ্য না নিয়ে চলে গেছেন। পরবর্তিতে আর একটা অর্ডার পেয়েছিলেন তাকে যথাসময়ে পন্য ডেলিভেরি দেওয়ায় তিনি পুনরায় অর্ডার দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি প্রথমে ছোট পরিসরে চন্দননপাট ইউনিয়াধীন বালাচওড়াহাটে একটি হস্তশিল্প কারখানা শুরু করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৭০ জন নারী কর্মী কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এই হস্তশিল্প কারখানায় পাটের তৈরী পাপস, ব্যাগ, টেবিল ম্যাট, প্লেট ম্যাট, ঝুড়িসহ ঘর সাজানোর বিভিন্ন পণ্য বর্তমানে তিনি দেশের জেলার পাশাপাশি বিদেশেও পণ্য রপ্তানী করছেন।

সাহাবাজপুর কামার সম্প্রদায়ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর মৌজার কামার পাড়ায় কামার সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। মূলত এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। বংশপরম্পরায় এরা দাঁ, কুড়াল, বটি, ছোরা ও বল্লমসহ লোহার তৈরী বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করে থাকেন। সরকারি ভাবে এই কামার সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা করে তাদের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার ও উপকরণ বাহিরে বাজার জাতের সু-ব্যবস্থা করতে পারলে এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ এলাকার উন্নয়ন হবে বলে সচেতন মহল মনে করেন।

চন্দনপাট ইউনিয়নের বিনোদন কেন্দ্র সমুহঃ

লাহিড়ীরহাট বদ্ধভূমিঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৭ মে ,১৯৭১ সালে নেকারপাড়া দেওডোবা বর্তমানে প্রেসিডেন্টের মোড় এলাকায় সেখানকার লোকজন আরবী ১২ রবিউল আউয়াল মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ-ই মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছিল। মিলাদ মাহফিলের সিন্নি রান্না করার সময় পাক হানাদার বাহিনি সেখানকার ৩২ জন নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে এসে লাহিড়ীরহাট পুকুরের (লাহিড়ীরহাট বধ্যভূমি) দক্ষিন এবং পশ্চিম পাড়ে দাড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেন। তারপর থেকে প্রায়শই এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিকামী মানুষকে ধরে নিয়ে এসে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ১৯৭২ সালে লাহিড়ীহাট বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মরনে স্থানীয় ছাত্র-যুবদের উদ্যোগে একটি একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল যাহা ২০১৮ ইং সালে সরকারী উদ্যোগে সংস্কার করা হয়েছে।

লাহিড়ীরহাট পুকুরঃ

ব্রিটিশ আমলে নীল চাষীদের মাধ্যমে ইংরেজরা এই পুকুরটি খনন করেন্। পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে বধ্যভূমি সমঋতিসৌ ও ঈদগাহ্ মাঠ এবং উত্তর পার্শ্বে কবরস্থান। এই পুকুরটিতেই সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ বিজয়া দশমীতে দূর্গা পূজা বিসর্জন দিয়ে থাকেন এর্ব বিজয়া দশমীতে এখানে মেলা বসে।

চন্দনপাট ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার (সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়)ঃ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি। ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি।

প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে আমরা শহীদ মিনারে যাই। সেখানে ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই অন্তহীন শ্রদ্ধা। শহীদ মিনার ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। এ ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থেই রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল বাঙালীর দামাল ছেলেরা। ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার।

উদ্যোগ ঃ

২০২২ খ্রিষ্টাব্দে চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউপি কার্যালয় চত্বরে একটি দৃষ্টিনন্দন শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভাষার জন্য উৎসর্গ করা শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করার এই বেদীতল নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে বিবেচনা করে শহীদ মিনারটির সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ এখনও চলমান।

সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় শহীদ মিনার ঃ

চন্দনপাট ঐতিহাসিক ভাবে এবং ব্যবসা বানিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সু-দুর অতীত হতেই চন্দনপাট সুনাম সর্বজন বিদিত। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে চন্দনপাট চত্ত্বর খুবই উর্বর। শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। চন্দনপাট এসকল ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালনকওে আসছে। সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশের বীর শহীদদের স্মরণ করার জন্য চন্দনপাট চত্ত্বরে শহীদ মিনার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেন চ্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাগণের অকুন্ঠ সমর্থনে নির্মিত শহীদ মিনারটি ইতিহাস, সাহিত্য, ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রে পরিনত হবে। ২০২২ ইং সালে ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমান সাহাবাজপুর শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থেকে স্কিম গ্রহণ পুর্বক শহীদ মিনারটি নির্মাণ সম্পুর্ন করা হয়।

চন্দনপাট ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহঃ

শিক্ষা		
ক্রমিক নং	তথ্য	সংখ্যা
০১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭ টি
০২	রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০০টি
০৩	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	০০টি
০৪	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	০১টি
০৫	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৩টি
০৬	মহাবিদ্যালয়	০৩টি
০৭	টিবিএম কলেজ	০০টি
০৮	ফাজিল মাদ্রাসা	০০টি
০৯	দাখিল মাদ্রাসা	৩ টি
১০	আলিম মাদ্রাসা	০০টি
১১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৯৮%
১২	বিদ্যালয়ে গড় উপস্থিতি	৮৫%
১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	০২%
১৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	২০%
১৫	প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে	১০০%
১৬	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে	৪০%

চন্দনপাট ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহঃ

০১। সাহাবাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০২। কাশিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৩। কলাগাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৪। সাহাবাজপুর কামারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৫। ঈশ্বরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৬। বালাচওড়াহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৭। বৈকুন্ঠপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৮। শ্যামপুর বন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
০৯। পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১০। খৈল্লাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১১। অযোধ্যাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১২। যাদবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৩। উমাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৪। শ্রীরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৫। মাটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৬। চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
১৭। উত্তর চন্দনপাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

১। সাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: সাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের লাহিড়ীরহাট সংলগ্ন সাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-১২১ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ২০০ জন।

২। কাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: কাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর গ্রামের কাশিপাড়ায় কাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-১০১ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৬৭ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১৬৮ জন।

৩। কলাগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: কলাগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর গ্রামে কলাগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৫৮ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৭১ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা–১২৯ জন।

৪। সাহাবাজপুর কামারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: সহাবাজপুর কামারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর গ্রামে সাহাবাজপুর কামারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭২ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৮১ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা -১৫৩ জন।

৫। ঈশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: ঈশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের কালিরথান বাজার সংলগ্ন ঈশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৮২ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৯৩ জন।

৬। বালাচওড়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: বালাচওড়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের বালচওড়াহাট সংলগ্ন বালাচওড়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৯৮জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-১৫৬জন। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাঃ ২৫৪ জন।

৭। বৈকুন্ঠপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: বৈকুন্ঠপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৫নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের বৈকুন্ঠপুর গ্রামে বৈকুন্ঠপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি ১৯৭২খ্রিঃ স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৬১ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৮৪ জন। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=১৪৫ জন।

৮। শ্যামপুর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: শ্যামপুর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী বাজার শ্যামপুর বন্দর সংলগ্ন শ্যামপুর বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় । বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭৫ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৮৯ জন। মোট ছাত্র ছাতীর সংখ্যা-১৬৪ জন।

৯। পুটিমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: পুটিমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমানের বাসা সংলগ্ন পুটিমারী গ্রামে পুটিমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় বিদ্যালয়টির পূর্ননির্মাণ হয় ২০০৫-২০০৬ খ্রিঃ। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৩১ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৫৭ জন। মোট ছাত্র ছাতীর সংখ্যা-৮৮ জন।

১০। খৈল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: খৈল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের শ্যামপুর মৌজার খৈল্লাপাড়ার নামানুসারে খৈল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭৪ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৯২ জন। মোট ছাত্র ছাতীর সংখ্যা-১৬৬ জন।

১১। অযোধ্যাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: অযোধ্যাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের অযোধ্যাপুর গ্রামে অযোধ্যাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টির পূর্ননির্মাণ হয় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৯২ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১৬২ জন।

১২। যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় বিদ্যালয়টি পূর্ননির্মাণ হয় ১৯৯৪ খ্রিঃ। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৮৫ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১৬৪জন।

১৩। উমাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: উমাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের উমাপুর গ্রামে উমাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-৫৫ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১২৫ জন।

১৪। শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের পূর্বদিকে শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, বিদ্যালয়টির পূর্ননির্মাণ হয় ২০০৫-২০০৬ খ্রিঃ। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৯৮ জন এবং ছাতী সংখ্যা-১০২ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা- জন।

১৫। মাটিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: মাটিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৯নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের পূর্বদিকে মাটিয়াপাড়াহাট সংলগ্ন মাটিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭৮ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-১০৯ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১৮৭ জন।

১৬। চন্দনপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: চন্দনপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৯নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের উত্তর দিকে চন্দনপাট মধ্যপাড়ায় মাটিয়াপাড়াহাট চন্দনপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় বিদ্যালয়টি পূনঃ নির্মাণ ১৯৯৫ খ্রিঃ। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৮ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৮৮ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-১০৪ জন। মোট ছত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১৯২ জন।

১৭। উত্তর চন্দনপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

ছবি: উত্তর চন্দনপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৯নং ওয়ার্ড)

চন্দনপাট ইউনিনের ইউপি সদস্য মোঃ মাজেদুল ইসলামের বাসা সংলগ্ন উত্তর চন্দনপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে মনোরম পরিবেশে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-৭০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা-১১০ জন। মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা-১৮০ জন।

চন্দনপাট ইউনিয়নের মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহঃ

শ্যামপুর মহাবিদ্যালয়ঃ

কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪ মে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এইচএসসি শ্রেনী কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে পরবর্তিতে স্নাতক ডিগ্রি খোলা হয় ১জুলাই ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে। কলেজটির এইচএসসি এমপিওভুক্ত হয় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং স্নাতক ডিগ্রি এমপিওভুক্ত হয় ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে। কলেজটি স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয় ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে। কলেজটিতে বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৪৪ জন এবং কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন ২০জন। কলেজটিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৯৩ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪৭৪ জন। উপজেলায় একটি মডেল কলেজ হিসেবে আগামী প্রজন্মের জন্য সাফল্যের সহযোগী হয়ে উঠার প্রত্যাশা রাখে সবুজে ঘেরা শ্যামপুর বন্দর ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটি।

সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ঃ

সময়টি ০১ জানুয়ারী ১৯৬৬খ্রিঃ। গরিব ছাত্রদের সুবিধার্থে সে সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ও সময়ের চাহিদা পুরণে এলাকাবাসীর সহযোগীতায় সাহাবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠান ১৫ মে ২০০০ খ্রিঃ তারিখে এমপিও লাভ করে। যা বর্তমানে ২০ জন শিক্ষক এবং ৬ জন স্টাফ নিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যায়নরত বর্তমান ছাত্র সংখ্যা-৪৭১ জন ও ছাত্রী সংখ্যা-৫১৪ জন। উপজেলায় একটি মডেল স্কুল হিসেবে আগামী প্রজন্মের জন্য সাফল্যের সহযোগী হয়ে উঠার প্রত্যাশা রাখে সবুজে ঘেরা লাহিড়ীরহাট ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটি।

শ্যামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ঃ

০১ জানুয়ারী ১৯৬৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি ০১ জানুয়ারী ১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে এমপিও লাভ করে। কলেজ শাখা ১৯৯৯ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু একন পর্যন্ত এমপিও ভুক্ত হযনি। প্রতিষ্ঠানটির স্কুল শাখায় বর্তমানে ১৬ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন এবং কলেজ শাখায় ১৫ জন শিক্ষক এবং ৪ জন কমৃচারী কর্মরত আছেন। স্কুল শাখায় ছাত্রী সংখ্যা-৪৫০ জন এবং কলেজ শাখায় ছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

মহিলা কলেজ লাহিড়ীহাটঃ

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক স্বীকৃতি পায় ২০০৯ খিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন ১৬ জন এবং কর্মচারী আছেন ৯ জন। প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত ছাত্রী সংখ্যা ১৪০ জন। এ প্রতিষ্ঠানটি চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রানকেন্দ্র লাহিড়ীরহাট বাজারের পাশে অবস্থিত। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় ২৪ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাটি এমপিওভুক্ত হয়নি। নারী শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয় ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের সবচেয়ে পুরাতন এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং এমপিওভুক্ত হয় ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। স্বীকৃতি প্রাপ্ত এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ ইং সালে ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বপ্রথম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২০ জন শিক্ষক এবং ৫ জন কর্মচারী আছেন। বিদ্যালয়টিতে সর্বপ্রকার আধুনিক সুবিধাদি নিয়ে স্ব-গৌরবে দাড়িয়ে থাকা চমৎকার ভবন, সবুজ ও সকলের জন্য উন্মুক্ত মাঠ, এবং শিক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখরিত এ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন প্রাণের মেলা। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা-২৫২ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩২০ জন।

অযোধ্যাপুর নিম্ন-মাধ্যমিকঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে বাবুরহাট সংলগ্ন অযোধ্যাপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ইউনিয়নের শেষ প্রান্তে মনোরম পরিবেশে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়ে এমপিওভুক্ত হয় ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৯ জন এবং কর্মচারী সংখ্যা ২ জন। বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা-১৩০ জন এবং ছাতী সংখ্যা-১৪৫ জন। বিদ্যালয়টির সামনের খেলার মাঠটি চন্দনপাট ইউনিয়নের বালকদের জন্য নির্ধারিত খেলার মাঠ হিসাবে বাচাই করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে ২০৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন ১৫ জন এবং কর্মচারী আছেন ৪ জন। প্রতিষ্ঠানটির দাখির শাখায় ছাত্রী সংখ্যা ১৬৫ জন এবং এবতেদায়ী শাখায় ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৪০ জন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় ২৮ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাটি এমপিওভুক্ত হয়নি। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম কার্যালয় ঃ

ছবি: সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম কার্যালয়।

ইউনিয়নের চন্দনপাট মৌজায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম কার্যালয় অবস্থিত। এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আধুনিক শিক্ষা উপকরনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসাঃ

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রাণ কেন্দ্রে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে বিদ্যোৎসাহী একদল ধর্মপ্রাণ মানুষ একত্রিত হয়ে ১৯৮৯ খ্রিঃ "চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয় ২০০২ খ্রিঃ। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন-১৭ জন, কমৃচারী আছেন-৩ জন। প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র সংখ্যা-১৪০ জন, ছাত্রী সংখ্যা-১৭২ জন।

প্রতিষ্ঠানটিতে একটি একাডেমিক ভবন আছে এবং চারতলা ভিত্তি বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণধীন। চন্দনপাট মাটিয়াপাড়া একরামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সহায়তায় ঐকান্তিক প্রচষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটির সামনের খেলার মাঠটি চন্দনপাট ইউনিয়নের বালিকাদের জন্য নির্ধারিত খেলার মাঠ হিসাবে বাচাই করা হয়েছে

শ্যামপুর একরামিয়া দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসাঃ

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রাণ কেন্দ্রে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে বিদ্যোৎসাহী একদল ধর্মপ্রাণ মানুষ একত্রিত হয়ে আসামের প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক হযরত (সাঃ) শাহ সুফি সৈয়দ একরামুল হক (রাঃ) এর নামে ১৯৯৪ খ্রিঃ "শ্যামপুর একরামিয়া দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র সংখ্যা-১৪০ জন, ছাত্রী সংখ্যা-২০ জন।
"শ্যামপুর একরামিয়া দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সহায়তায় ঐকান্তিক প্রচষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন।

চিত্রঃ শ্যামপুর একরামিয়া দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা

উত্তর চন্দনপাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ঃ

প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে। একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক আছেন ১৫ জন এবং কর্মচারী আছেন ৪ জন। প্রতিষ্ঠানটির দাখিল শাখায় ছাত্রী সংখ্যা ১৬৫ জন এবং এবতেদায়ী শাখায় ছাত্র সংখ্যা ৪৬ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮০ জন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রায় ২৮ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাটি এমপিওভুক্ত হয়নি। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা জরুরী।

চিত্রঃ উত্তর চন্দনপাট বালিকা দাখিল মাদ্রাসা

চন্দনপাট ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ

স্বাস্থ্য-মানব উন্নয়ন পরিমাপের একটি বিশ্বজনীন সূচক। বাংলাদেশে সংবিধান, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে অর্জনে বাংলাদেশ সরকার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য কর্মিরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতাধীন ইউনিয়নের এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও মাঠ পর্যায়ে যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাহলো-

রোগ নিরাময়।

রোগ নিয়ন্ত্রণ বা রোগ প্রতিরোধ।

নিরাপদ গর্ভাবস্থা এবং নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করে মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষা করা।

ডায়রিয়া রোগীদের ওআরএস সরবরাহ করা।

শিশু ও মহিলাদের ইপিআই কার্যক্রমের আওতায় প্রতিষেধক টিকা দেওয়া।

স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক সররবাহ সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবাকেন্দ্র গুলো হতে বিনামূল্যে প্রদান করা।

চন্দনপাট ইউনিয়নের মানুষ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে কৃতজ্ঞ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা		
ক্রমিক নং	**তথ্য**	**সংখ্যা**
০১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০১ টি
০২	কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪ টি
০৩	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	০৮ টি
০৪	জরুরী বিভাগের স্বাস্থ্য সেবা	-
০৫	বহিঃবিভাগের স্বাস্থ্য সেবা	চলমান
০৬	টিকাদান কর্মসূচী	চলমান
০৭	টিকাদান কেন্দ্র	২৪ টি
০৮	শিশু টিকাদানের হার	৯৯ শতাংশ
০৯	শিশু অপুষ্টির হার	২০ শতাংশ
১০	শিশু মৃত্যুর হার	০৫ বছরের নিচে হাজারে ২৫ জন
১১	জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	চলমান (বড়ি, কন্ডম, ইনজেকশন, ইমপ্লান্ড, আইইউডি)
১২	জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী দম্পতির হার	৬২.৯৮ শতাংশ
১৩	মাতৃ উর্বরতা হার	১.৮
১৪	শিশু জন্ম পূর্ববর্তী চেকআপ	১ বার ৯০% এবং ৪ বার ৬৫%
১৫	প্রশিক্ষিত ধাত্রী (সরকারী ব্যবস্থাপনায়)	২০ জন
১৬	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি লক্ষে ১৭৬ জন

জনস্বাস্থ্য		
ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
০১	মোট জনসংখ্যা	৩৯৫৪৬ জন
০২	খানা সংখ্যা	৯০২৫ টি
০৩	মোট নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা	৮৫৬০ টি পরিবার (৯৫%)
০৪	মোট দরিদ্র খানা	২০৫০ টি পরিবার (২৩%)
০৫	স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী	৪৫৬৫ টি পরিবার (৫১%)
০৬	অস্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী	১৮৫০ টি পরিবার (২০%)
	ল্যাট্রিনবিহীন পরিবার	৩৫৫ টি পরিবার (৪%)
০৭	পাবলিক টয়লেট	৫ টি
০৮	নলকুপের সংখ্যা	৮৫৭২ টি
০৯	হস্তচালিত নলকুপ (গভীর)	৮৩৫০ টি
১০	মন্দিরে নলকূপ ও ল্যাট্রিন সংখ্যা	৯ টি
	মসজিদে ল্যাট্রিন ও নলকূপ সংখ্যা	৫৬ টি
১১	হাট-বাজার	৫ টি
১২	বাস/টেম্পু/রিক্সাস্ট্যান্ড	৩ টি
১৩	সামাজিক প্রতিষ্ঠান (ক্লাব/সমিতি ইত্যাদি)	৯ টি

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ

স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ নিয়ে গঠিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এখানে কর্মরত আছেন ০১ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, ০১ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ০১ জন পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা, ০৪ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ০১ জন দাইনার্স, ০১ জন অফিস সাহায়ক ও ১ জন আয়া। এখানে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নরমাল ডেলিভারী ইউনিটে ডেলিভারী সেবা প্রদান করা হয়। Lamp (বর্ন অন টাইম) এনজিওর মাধ্যমে গঠিত হইলেই বর্তমানে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ায় বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমান সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সেবা চলমান রয়েছে।

সেবাসমূহ ঃ সকল সাধারন রোগের পরামর্শ, পরিবার পরিকল্পনার সকল পদ্ধতি, প্রসব পূর্ববর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা, স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয় ও ৩০ প্রকার ঔষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক ঃ

কমিউনিটি ক্লিনিক সরকারের একটি সফল প্রতিষ্ঠান। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার প্রাণ কেন্দ্র কমিউনিটি ক্লিনিক। স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা '১৯৯৬' ইং সালে রাষ্টীয় ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৮ ইং সালে স্থাপিত হয়। স্টাফ বা কর্মচারী-০৩ জন। সিএইচসিপি-০১ জন , সপ্তাহে ৬ দিন। স্বাস্থ্য সহকারী-০১ জন, সপ্তাহে ০৩ দিন। পরিবার কল্যাণ সহকারী-০১ জন, সপ্তাহে ০৩ দিন। ঔষুধ সরবরাহ ৩০ (ত্রিশ) প্রকার। মা ও শিশু এবং সাধারন রোগীদের জন্য।

ধারাবাহিকতায় রংপুর জেলার সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের ১,৫,৭ ও ৯নং ওয়ার্ডে চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়। যথা-

* সাহাবাজপুর কমিউনিটি ক্লিনিক (ওয়ার্ড নং-১)
* বৈকুন্ঠপুর কমিউনিটি ক্লিনিক (ওয়ার্ড নং-৫)
* অযোধ্যাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক (ওয়ার্ড নং-৭)
* চন্দনপাট কমিউনিটি ক্লিনিক (ওয়ার্ড নং-৯)

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ পর্যায়ের মানুষের অংশ গ্রহণে এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্বের দরবারে এই পদক্ষেপ একটি মডেল ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সেবা সমূহ ঃ

* গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ব ও পরবর্তী সেবা দেওয়া হয়।

সাহাবাজপুর কমিউনিটি ক্লিনিক

বৈকুন্ঠপুর কমিউনিটি ক্লিনিক

অযোধ্যাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক

চন্দনপাট কমিউনিটি ক্লিনিক

কোভিড-১৯ঃ

কোভিড-১৯ ঃ

কোভিট-১৯ চলাকালীন সময়ে ০৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের তত্বাবধানে কোভিট-১৯ সম্পর্কে সচেতন মূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রচারনা চালানো হয়।

চন্দনপাট ইউনিয়নের কৃষির তথ্যাবলীঃ

ক্রঃ নং-	আবাদযোগ্য জমি	পরিমাণ
০১	ইউনিয়নে মোট আবাদযোগ্য জমি	২৬০০ হেক্টর
০২	একক ফসলী জমি	১৬০ হেক্টর
০৩	দুই ফসলী জমি	২০৮০ হেক্টর
০৪	তিন ফসলী জমি	৩৬৬৮ হেক্টর
০৫	বাগান	৭ হেক্টর
০৬	উচু জমি	১২১০ হেক্টর
০৭	মাঝারি উচু জমি	১২৯৯ হেক্টর
০৮	মাঝারি নিচু জমি	৭৪ হেক্টর
০৯	আতি নিচু জমি	১ হেক্টর
১০	মোট খাদ্য চাহিদা (বছরে)	৬৫৯৩ মেঃ টন
১১	খাদ্য উৎপাদন	১৩৪০৮ মেঃ টন
১২	খাদ্য উদ্বৃত্ত	৬৮১৫ মেঃ টন
১৩	ফসলের নিবিড়তা	২৪৮%

একটি খাদ্য উদ্বৃত্ত ইউনিয়ন, ইউনিয়নের মোট ২৬০০ হেক্টর আবাদী জমি রয়েছে। এখানকার মাটি বেশ উর্বর। প্রায় ৯০% জমি সেচ সুবিধার আওতায় রয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বছর ধরে ফসল উৎপাদন করতে ইউনিয়নের কৃষকরা খুবই দক্ষ। ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা উচু থেকে মাঝারী উচু হওয়ায় স্বাভাবিক বন্যায় ফসল হানির ঝুকি কম। ফসল উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের আগ্রহের কমতি নাই। বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি যেমনঃ পুঁইশাক, লালশাক, ঢেড়ঁস, শিম, মুলা, গাজর, করলা, চিকিংগা, বেগুন, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, আলু, প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরণের ফল যেমনঃ আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, কলা, বড়াই, জলপাই, সুপারি ও নারিকেল প্রভৃতি। অন্যান্য ফসল যেমনঃ ধান, পাট, গম, আলু, ভুট্টা, সরিষা মুগ, মশুর, খেসারী, , পেয়াজ, রসুন, ইক্ষু, প্রভৃতি চাষে এ উপজেলার কৃষকরা খুবই দক্ষ। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে এ উপজেলার প্রায় ৮০% কৃষক সচ্ছল। এতকিছুর পরও বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া বরেন্দ্র এলাকায় খরিপ-১ মৌসুমে, খরিপ-২ ও রবি মৌসুমে পানির স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে সম্পুরক সেচের প্রয়োজন হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন সব ধরনের ফসল ফলমূল এবং রবি শস্য-এর জন্য বিখ্যাত অঞ্চল। বর্তমানে ড্রাগন ফল, কাজু বাদাম, কফি, মালটা, গ্রীষ্ম কালীন পিয়াজ, উৎপাদন হচ্ছে এবং মিষ্টি আলু, লতি রাজ কচু ও রোপা আউশ-এর জন্য বিখ্যাত। পারিবাবিক পুষ্টি বাগান, ছাদ বাগান এবং বিভিন্ন ফলের বাগান রহিয়াছে। যেমন, বড়াই বাগান, কলা বাগান, লিচু বাগান, পেয়ারা বাগান, ও হাড়ি ভাঙ্গা আম বাগান। যা এলাকার পুষ্টি ও খাদ্যের চাহিদা পূরণের পরও কয়েক শত কোটি টাকার ফসল ও রবি শস্য ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে রপ্তানি করা হয়।

চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রধান কৃষি ধান

বাংলাদেশের কৃষির প্রধান ফসল ধান। দেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম জেলা রংপুর। রংপুর এলাকার জমি দোঁ-আশ,বেলে-দোঁ-আশ, এটেল-দোঁআশ এবং কোন কোন এলাকার মাটি এটেল ও বটে। অল্প সংখ্যক এলাকা লালমাটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। অধিকাংশ জমি পলি দ্বারা গঠিত। তাই ধান চাষের খুবেই উপযোগী। চন্দনপাট ইউনিয়নে মোটামুটি দুই মৌসুমে আল্লাহর দেওয়া বৃষ্টির পানিতেই সাধারণত কৃষকেরা ধানের চাষ করে থাকেন। মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হলে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে আমন ধানের জমিতে সেচ দিয়ে থাকেন। কৃষকেরা আমন ধান সারা বছরের জন্য গোলায় খাবারের জন্য সংরক্ষন করেন এবং ধান গাছকে আঁটি বেধে বাড়ীর উঠানে গবাদী পশুর খাদ্যের জন্য সংরক্ষন করেন।

আউষ মৌসুমে তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় সেচ ক্যানেলের মাধ্যমে বরেন্দ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অগভীর নলকুপের মাধ্যমে সেচ দিয়ে বোরো ধানের চাষ করা হয়। অল্প-স্বল্প পছন্দ মাফিক জাতের ধান ছাড়া অধিকাংশ উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ধান চাষ করা করা হয়। রোদ-বৃষ্টির তারতম্যের উপর নির্ভর করে এ মৌসুমের ধান ও খড় সংরক্ষন হয়। অতিবৃষ্টি হলে এবং রোদ কম হলে খড় নষ্ট হয়ে যায় বেশির ভাগ। ধান কৃষক বিক্রয় করে দেয় তারাতারী ফলে কৃষক হয় ক্ষতিগ্রস্থ । মধ্যসত্বভোগীরা হয় লাভবান এ সময় কৃষককুলকে বিপুল ক্ষতির কবর থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারী ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন।

আখঁ চাষে ঈর্ষনীয় সাফল্য

উপরে ছবিতে আঁখের ক্ষেত ।

আঁখ, ইক্ষু,গেন্ডারি বা কুষার যাই বলিনা কেন! জিনিষ একটাই গুড় বা চিনি তৈরীর প্রধানতম কাঁচামাল আঁখ। দেশীয়মাড়াইকলে আঁখ থেকে রস নিংড়িয়ে রস বড় কড়াইয়ে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করা হয়। গুড়ইউক বা চিনি হউক আখঁ থেকে রস সংগ্রহ করা লাগবেই, তবে খেজুর রস ও তালেররস থেকেও গুড় তৈরী করা যায়। আগে শুধু মাত্র চিনি বা গুড় তৈরীর জন্য আঁখেরচাষ করা হত। কাঁচায় চিবিয়ে খাওয়ার জন্য ডেইরী ফার্ম জাতের মোটা ও নরম জাতের আখেঁর প্রচলন হয় স্থানীয় ভাবে তাকে গেন্ডারী বলে। শহর বন্দরে দেশী হাতমাড়াই কলে গেন্ডারীর রস বের করে বিক্রি করা হয়। বর্তমানে এই ধরনের আখের চাষ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য ফসলের তুলনায় গেন্ডারী চাষে অধিক লাভ । পুর্বে এধরনের আখঁ বাজারজাতকরা অসুবিধাজনক ছিল। কিন্তু এখন বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে আখের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ কারায় কৃষক এখন এধরনের আখঁ চাষ করে একরে প্রচুর টাকা ঘরে তুলছে । আঁখেরব্যবসায়ীরা জমি থেকেই আঁখকেটে নিয়ে যায় এবং একদিনেই এক থেকে দুই একর আঁখকেটে জমি খালি করা যায়। চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর, ঈশ্বরপুর, হরিপুর, অযোধ্যাপুর ও চন্দনপাট সহ অনেক গ্রামের কৃষকরা আখঁ চাষ করে প্রচুর টাকা উর্পাজন করছে। আখঁ একটি অর্থকারী ফসল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

আল্লাহর কি কুদরত!

লাঠির ভিতর সরবত!!

আঁখেররস প্রধানত সরবত হিসাবে ব্যবহার হলেও আখেঁর রসের ঔষধী গুন রয়েছে। কালপান্ডুর বা জন্ডিস রোগে আর্য়ূবেদিক মতে আখেঁর রস আঁখচিবিয়ে খেলে উপকার হয়।

ভূট্টা চাষে সফলতা

ছবি: উপরে ভুট্টা ক্ষেত ও নিচে ভুট্টা মাড়াই করণ

পাপ্পন বা ভূট্টার খৈ চিনেন না এমন লোক কমেই আছেন। ভূট্টাকে স্থানীয় ভাষায় যোয়ার বলা হতো। ভূট্টা একবীজ পত্রী একটি দানাদার শস্য। ধান ও গমের মতই ভূট্টা এখন খাদ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ভূট্টা সাধারনত গো- খাদ্য হিসাবে বনিতার নিকট আর্কষনীয়। ভূট্টা দোঁ- আশ, বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ভাল জন্মে। ভূট্টার সবুজ গাছও পাতা গবাদী পশুর জন্য উৎকৃষ্ঠ খাবার। ভূট্টার পাতার সাইলেজ প্রানীবিদদের মতে পুষ্টিকর। শুকনা ভূট্টা গাছ ও ভূট্টার মোচা খুব ভালো জ্বালানী হিসাবে বিবেচ্য । সর্বপরি ভূট্টা চাষে তুলনা মুলক খরচ কম হওয়ায় চাষী আর্থিক ভাবে লাভবান হয়। যথাযথ পরির্চযা করলে একরে ১০০ থেকে ১২০ মন ভূট্টা পাওয়া যায়। নিম্নতম বাজার মূল্য হলেও আশি হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা আয় হয়। অত্র ইউনিয়নের কৃষক দিন দিন ভূট্টা চাষে অধিক মনোযোগী হচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উন্নত বীজ সার ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সহ আবশ্যকীয় পরার্মশ ইউনিয়নের দায়িত্বশীল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তগন প্রদান করছেন।

কৃষি তথ্য ঃ

কৃষি মাঠ,

ফলের চাষ

ফলের রাজা আম

ছবিঃ আম বাগান

স্বাদে মজাদার গন্ধে চমৎকার রুচিতে জনপ্রিয় ফলের রাজা আম। মুকুট বিহীন রাজা। ফলের মধ্যে আনারসের মুকুট আছে কিন্তু আমের মুকুট নাই। ফলের রাজত্বে আমের আধিপত্য এত বিশাল যে একমাত্র জাতীয় ফল কাঁঠালের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছাড়া আমের জনপ্রিয়তার নিকট সব নস্যি বাংলাদেশে ভারত উপ-মহাদেশের একটি দেশ । আম ভারতীয় ফল হিসাবে বাংলারদেশীয় ফল। ইংরেজি নাম ম্যাংগো আর আমের বোটানিক্যাল নাম হচ্ছে ম্যাঙ্গিঁকেরা ইন্ডিয়া।

ভারত উপমাহাদেশের দেশ গুলি ছাড়াও অন্যান্য দেশে আমের চাষ হয়। আমের জাত এত বেশী যে, আমের প্রজাতির একটি স্বতন্ত্র বই তৈরী হবে। আমাদের বাংলাদেশেই প্রায় একশত প্রকার আম ফলতে দেখা যায়। জাতীয় ভাবে গবেষনার ফলে দিনে দিনে বহু সংকর জাতের আমের আর্বিভাব হচ্ছে।

রংপুরের বিভিন্ন স্থানে গ্রামীন পর্যায়ে আমের সংকারায়ন করা হচ্ছে । এরকম একটি আমের নাম হাড়ীভাংগা। একমাত্র রংপুরেই এই আম পাওয়া যায়। চন্দনপাট ইউনিয়নের বিভিন্ন ফল বাগানে হাড়ীভাংগা আমের চাষ হয়। এ আম অত্যন্ত মিষ্টি ও আশঁ বিহীন। একটু ডাঁসা থাকতেই এই আম খুব মজাদার। বেশী পাকলে দানা গুঁড়ের মত হয়ে যায়। টকের কোন বালাই নাই। নার্সারীর অন্যতম ভাল আম হচ্ছে

আম্যপালী। এ আম টকের আমেজে কিছুটা মিষ্ঠি। ফলন হয় প্রচুর। চাষীরা হাড়ীভাংগা ও আম্রপালী চাষে খুবেই লাভবান। বিভিন্ন বাড়ীতে বিভিন্ন আম দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে গোলাপ খাস, ফজলি, আশ্বিনা, ল্যাংড়া, ক্ষীরসাপাতি, লক্ষনভোগ, বোম্বাই, মিছরিদানা, চৌসা, বৃন্দাবনী, চন্দনী, সুন্দরী, দুধসর, সিন্দুরা, মেহের সাগর, ,মল্লিকা , মধু চমকী, সুবর্নলতা, নিলাম্বয়ী, কাঁচামিটা, কলাবতি, গৌড়মতি, লখনা , পালসার, রাজলক্ষী, মাধুরী, চন্দনাখোস, দিলসাদ ইত্যাদী। কৃষি বিভাগ হতে বাড়ী -৭ জাতের আম চাষ করা হচ্ছে।

অর্থকারী সুস্বাদু ফল কলা

ছবিঃ কলা বাগান

আয়রন সমৃদ্ধ বারোমাসি পুষ্টিকর ফলের নাম কলা। সারা বছর যে ফল গুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে কলা অন্যতম। এমন লোক পাওয়া যাবে না যে কলা পছন্দ করে না। পুষ্টিগুনে ভরপুর কলা প্রায় সব ধরনের মাটিতে হয়। কলা বিভিন্ন জাতের দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে অমৃতসর, চাঁপা, কালিকুমার, মনুয়া, চিনিচম্পা, সবরি, জি-৯সাগর কলা, রঙ্গিন সাগর কলা, বাংলা কলা, বারি-১, আটিয়া কলা ওকাছঁকলা প্রধান। আগে শুধু নিজ প্রয়োজনে কলার চাষ করে পরিবারের চাহিদা পূরন করা হত। এখন কলা অর্থকারী ফসল হিসাবে বানিজ্যিক ভাবে চাষ করা হয়। কাট কলা উৎকৃষ্ঠ মানের সবজি হিসাবে বাজারে চড়াদামে বিক্রয় করা হয়। অত্র হরিদেবপুর ইউনিয়নের কৃষকেরা কলা অর্থকরী ফসল হিসাবে চাষ করেন। কলার ক্ষেতে সাথী ফসল হিসাবে অন্যান্য ফসলের চাষ করে অধিক লাভবান হচ্ছেন। আমজনতার মুখে শোনা যায়,

কলা রুইয়ে না কাট পাত!

তাতে কাপড় তাতে ভাত!!

কলা একটি উপাদেয় ফল। ভিটামিন ও খনিজ লবনে ভরপুর এই ফল শরীরের ক্ষয় পূরণ করে, নব উদ্যোমে সঞ্চার করে। কলার পাতা উন্নতমানের গো-খাদ্য । কলার গাছের কান্ডের ভিতরের অংশ পুষ্টিমানে ভরপুরএক ধরনের সবজি। কলার ছাল বা ছোবরা গরু ও ছাগলের জন্য অতুলনীয় খাবার।

উন্নত জাতের ঘাসের চাষ একটি লাভজনক কৃষি

ছবি: উন্নত জাতের নেপালীয়ান ঘাস বাগান

গবাদী পশুর প্রধান খাদ্য শুকনা খড়ের পরেই ঘাসের স্থান। দেশী ঘাস খাওয়ানের সুযোগ এখন আর নাই । জমিতেঘাস হবে কোথায়। পতিতজমি দেশী ঘাসের আতুর ঘর। পতিত জমিতে ফসল রোপন করায়, আবার ফসলি জমিতে এক ফসলের পর আবার ফসল ফলানোয় দেশে জমি পতিত আর থাকেনা এবং দেশী ঘাস বর্ধনশীল না হওয়ায় দেশী ঘাসের পরিবর্তে চাষীরা এখন উন্নতমানের স্বল্প সময়ে বর্ধনশীল ঘাসের চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। উন্নত জাতের ঘাসের মধ্যে অত্র হরিদেবপুর ইউনিয়নের চাষীরা নেপিয়ার, প্যারা, গিনি, জারা, পাকচং, জাম্বু বাকসা , জার্মান ও ভূট্টার চায় করছেন। ৪০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যেই একট্রিপ ঘাস কর্তন করা যায়। একবার রোপন করে একনাগারে অবস্থাভেদে ২/৩ বছর ফলন পাওয়া যায়। কর্তনের পর শুধু একবার নিড়ানী দেয়া, সার প্রয়োড় এবং কয়েকবার সেচ দেওয়া ছাড়া বলতে গেলে কোন পরিশ্রমই নাই। তাই খরচ কম লাভ বেশী। স্বল্প সময়ে বর্ধনশীল হওয়ায় এই ঘাসগুলি খুবেই নরম ও রসালো হয় এবং পশুর নিকট হয় মজাদার। গবাদী পশু মোটা তাজা করন ও দুধের জন্য এই ঘাস খুবই উপকারী । যে খামারী গবাদী পশুর গো- খাদ্য ক্রয় করেন তার জন্য এই ঘাসের বিকল্প নাই। আর যারা গবাদি পশুর খামারী নন তারাও এই ঘাস চাষ করে অধিক লাভবান হন। এই ঘাসের কদর কৃষক ও খামারীর নিকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলের বাগান ঃ

কৃষিতে সেচ ব্যবস্থা

বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্প

ছবি: ধান ক্ষেতে বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্প।

অত্র চন্দনপাট ইউনিয়নের মধ্যভাগে কোন নদী অথবা হাওড় বাওড় বিলঝিল নেই। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের দুইটি সেচ ক্যানেল থাকলে ও যে সব অঞ্চলে এই সুবিধা গুলির কোনটি ও নেই, সেই সব এলাকায় বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ্য পানি উত্তোলন করে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। সেচ পাম্পের ঘর থেকে জমির উচু নিচু শ্রেনী অনুযায়ী মাটির নিচ দিয়ে পাইপের মাধ্যমে জমিতে পানি সরবরাহ করা হয় । ইহার ফলে জমিতে সেচ নালার প্রয়োজন হয় না। যদিও এ ব্যবস্থায় ভূগর্ভস্থ্য পানির স্থর নিচে নেমে গিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কিন্তু বিরুপ আবহাওয়ায় নিরুপায় হয়ে সেচের এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল । ইউনিয়নের সাহাবাজপুর, ঈশ্বরপুর, হরিপুর ও চন্দনপাট মৌজায় বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্পচালু আছে ।

তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প

ছবি: তিস্তা ক্যানেল

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষত রংপুর বিভাগের সর্ববৃহত সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্রারেজ সেচ প্রকল্প। রংপুর অঞ্চলের ইরি মৌসুমে খরার সময় সেচ দেওয়া অপরিহার্য।

দুই ভাবে জমিতে সেচ দেওয়া যায়।

(১) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। গভীর নলকূপ, শ্যালো , হস্ত চালিত নলকূপ, পা চালিত বন্ধু নলকূপ, তারাপাম্প এবং কুয়া খননের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে জমিতে জল সেচ দেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগন মনে করেন ইহাতে ভূগর্ভস্থ পানির স্থর নিচে নেমে যায় এবং মরুভূমির মত পরিবেশ বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয়। পরিবেশ বান্ধব না হওয়ায় এভাবে জমিতে জল সেচ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

(২) মাটির উপরিভাগস্থ জলাধার থেকে জমিতে সেচ দেওয়া যায়। পুকুর নালা, বিল-ঝিল, হাওড়, নদী, ঝর্ণা, ইত্যাদী থেকে পানি উত্তোলন করে জমিতে জল সেচ দেওয়া সম্পূর্ন পরিবেশ বান্ধব। ইহাতে পরিবেশে কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। আর এ পানিতে জৈব উপাদান দ্রবিভূত থাকায় জমির জন্য উর্বর। এ রকম সেচের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষঞ্জগন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অত্র চন্দনপাট ইউনিয়নে কোন নদী নালা না থাকায় এই ইউনিয়নে তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প, দুইটি সেচ ক্যানেল তৈরী করেছে। যাহা রংপুর সেচ ক্যানেল এর সাথে লালচাঁদপুর সুইজগেট ও মহেষপুর সুইট গেটের সাথে সংযুক্ত রয়েছে এই সেচ ক্যানেল দুইটি । অত্র ইউনিয়নের আরাজী হরকলী হাজরার ঝাড়পাড়া ও কুর্শা বিলের পাশে রামনাথপুর মৌজায় প্রবেশ করে ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে দক্ষিনে চন্দনপাট ইউনিয়নে চলে গেছে। এই দুইটি সেচ ক্যানেল দিয়ে স্বল্পমূল্যে জলসেচ দেওয়ায় কৃষক লাভবান হচ্ছে। আর উপরিভাগের জৈব সার দ্রবিভূত থাকায় ফসল তুলনামূলক ভাল হয়। তাই কৃষক এই সেচ প্রকল্পের স্থায়িত্ব কামনা করে।

মৎস চাষ ও সবজি চাষে চন্দনপাট

চন্দনপাট ইউনিয়নে মাছ চাষ

ছবি: মাছ চাষ

মাছ একটি অর্থ উপার্জনকারী কৃষি। ইউনিয়নের উন্মুক্ত জলাশয়গুলি জনগনের ফসলি জমির সাথে সংযুক্ত থাকায় অপরিকল্পিত ভাবে দেশীয় মাছে দেশের চাহিদা পুরন করা সম্ভবপর ছিল না। আর চাষাবাদী জমির সংলগ্ন থাকায় ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করা কীটনাশক ও রাসায়নিকের বিরুপ প্রভাবে দেশীয় মাছের উৎপাদন ব্যহত হত। এ কারনেই উন্মুক্ত জলাশয় যেমন বাইশা বিল, কুর্শা বিল, রুহিয়া বিল ইত্যাদি বিল গুলি পুকুর খননের মাধ্যমে আলাদা করা হয় এবং বৈজ্ঞানী পদ্ধতিতে উক্ত পকুরে মাছের চাষ করা হচ্ছে। বিলগুলি সরকারী ভাবে ইজারাদেয়া হয়। ইজারাদার উক্ত বিলগুলিতে মাছ চাষ করে দেশের বাজারে মাছের চাহিদা পূরন করছেন এবং দেশের অর্থনীতিতে আশা ব্যঞ্জক ভূমিকা রাখছেন। ইউনিয়নের জেলে সম্প্রদায় প্রধানত মাছ চাষের সাথে জড়িত। হরিপুর মাঝিপাড়ায় প্রায় শতাধিক জেলে পরিবারের বাস। চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ জেলেদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা দিয়ে আসছে ।

হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল ও মৎস চাষ ঃ

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণীসম্পদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অনাদিকাল থেকেই এদেশের মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার তাগিদে গবাদি পশু-পাখি লালন-পালনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। জিডিপি'তে প্রাণীসম্পদ খাতের অবদান ২.৫%। এই খাত থেকে মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান প্রাণীজ আমিষ (দুধ, মাংস, ডিম) ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৫০% প্রাণীসম্পদ বিভাগ থেকে আসে। আমাদের জন সংখ্যার প্রায় ২২% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণীসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। দারিদ্র বিমোচন, নারী-পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রাণীসম্পদ খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বর্তমান সরকার এ খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রতিবছর ঈদ-উল-আযাহার ঈদে চন্দনপাট ইউনিয়ন থেকে প্রায় সহস্রাধিক গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া,ইত্যাদি ট্রাক যোগে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যায়। এতে করে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া পালনকারীগণ অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

গাভী পালন ও দুধ উৎপাদন ঃ

রংপুর জেলার সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন একটি কৃষি নির্ভরশীল অঞ্চল। এই ইউনিয়নের প্রায় ঘরে ঘরে গাভী ও ষাঁড় পালন করা হয়। গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রতা হ্রাসসহ অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছলতা অর্জন করে যাচ্ছে।

চন্দনপাট ইউনিয়নে প্রতিদিন প্রায় ৪৫০০ লিটার দুধ উৎপাদন হয়। উৎপাদিত দুধ রংপুর বিভাগীয় শহর ও স্থানীয় হোটেল ও মিষ্টির দোকানদাররা ক্রয় করে ঘি, মাখন, ননী, মাঠা, ঘোল, চিজ, দধি, মিষ্টি, ছানা, লাচ্চি, বোরহানি, মন্ডা, রসমালাই, ক্ষীরসা-সহ আরো অনেক ধরনের সু-স্বাদু খাদ্য তৈরীর চাহিদা থাকে। চন্দনপাট ইউনিয়নের জন সাধারণের দুধের চাহিদা পূরণের পর বাহিরে বিক্রি করা হয়।

গরু পালন

ছবি: চন্দনপাট ইউনিয়নে গবাদি পশু মোটাতাজা করণ।

গরু পালন পরোক্ষ কৃষির অর্ন্তভূক্ত। চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামে কমবেশী গরু পালন করা হয়।কৃষক ও প্রান্তীক খামারি দেশীয় গরুর মধ্যে পাবনাই, চাটগাই,ফরিদপুরী, মুন্সিগন্জের গরু থারপার্কার, লালসিন্দি,হরিয়ানা গরু পালন করেন। উন্নত জাতের মধ্যে শাহীওয়াল, হলেটইন ফ্রিজিয়ান,জার্সি ব্রাউন সুইট গরুও দেখতে পাওয়া যায়। কৃষকরা ১/২টি গরু এবং প্রান্তীক খামারীরা ১০/১২টি গরু খামার আকারে পালন করেন। গবাদী পশু পালনের পৃষ্টপোষকতা করার জন্য পশু সম্পদবিভাগের বিশেষজ্ঞ পশু চিকিৎসকগনকে নিয়মিত ভাবে কৃষক ও খামারীর বাড়ী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলে এবং গো-খাদ্য মূল্য খামারীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ন্ত্রনে রাখলে আগামীতে গবাদী পশু পালন ব্যপকতা লাভ করবে বলে সবাই বিশ্বাস করেন॥

পোলট্রি খামার

বয়লার মুরগী অথবা পোল্ট্রি ফার্ম

দ্রুত বর্ধনশীল মুরগী পালন পরোক্ষ কৃষির অর্ন্তভূক্ত। ২৮ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে এই মুরগী বিক্রয়যোগ্য হয়। হরিদেবপুরের খামারীগন কাজী ফার্ম, নারিশ, সিপি বাংলাদেশে, প্যারগন, নীলসাগর প্রভূতি নার্সারী থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করে মুরগী পালন করে। মাংসের জন্য ব্রয়লার মুরগী এবং ডিমের জন্য লেয়ার মুরগী পালন করা হয়। চন্দনপাট ইউনিয়নে প্রায় অর্ধশতাধীক মুগীর খামার আছে। পোলট্রি খামারে মুরগী পালনের মাধ্যমে দেশের আমিষের চাহিদা পূরন হয়। বেকারত্বের প্রভাব কমে এবং আর্থীক সচ্ছলতা আসে। কিন্তু সরকারের দ্বায়িত্বরত নীতি নির্ধারকগনের অব্যবস্থাপনা এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অবহেলা ও অনিহার কারনে পোলট্রি খামারীরা প্রায় সময় লোকসানের মধ্যে পরেন। পোল্ট্রি সেক্টর সুচিন্তি ভাবে নিয়ন্ত্রন করিলে গার্মেন্টস শিল্পের পরেই ইহা অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই।

০৫। হরিপুর জেলে সম্প্রদায় ঃ

মাছ ধরা আমাদের দেশের ঐতিহ্য। একটা সময় সব এলাকায় মাছ ধরার কাজের খুব প্রচলন ছিলো। সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে জেলে পরিবার।

চন্দনপাট ইউনিয়নের হরিপুর মৌজায় জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। মূলত এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। বংশপরম্পরায় এরা জাল তৈরী ও মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে। এই পেশাই তাদের একমাত্র অবলম্বন। সরকারি ভাবে এই জেলে সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা করে তাদের তৈরি জাল ও মাছ ধরার অন্যান্য উপকরণ বাহিরে বাজার জাতের সু-ব্যবস্থা করতে পারলে এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ এলাকার উন্নয়ন হবে বলে সচেতন মহল মনে করেন।

চন্দনপাট ইউনিয়নের নদী ও খাল-বিল

খাল ঃ

খাল (CANAL) ঃ

মানব সৃষ্ট উন্মুক্ত জলপ্রবাহ। সেচ ও জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদণের উদ্দেশ্যে খাল খনন করা হয়ে থাকে। খাল খননের ক্ষেত্রে পানি প্রবাহ, সহজলভ্যতা ও ভূ-প্রকৃতি বিবেচ্য বিষয়। পানি বহনকারী সর্পিলাকার খাল গুলি সরু হওয়ায় বর্ষামৌসুমে প্রবল বেগে পানি প্রবাহ হয়। চন্দনপাট ইউনিয়নে ফসলের মাঠের শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ডালিযার ক্যানেল নামে একটি খাল আছে।

০১। সাহাবাজপুর মৌজা থেকে চন্দনপাট ডাঙ্গিরপাড়।

বর্তমানে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়। সরকারী উদ্যোগে খাল গুলো পূনঃ খনন করে পানির প্রবাহ ঠিক রাখতে পারলে কৃষকরা উপকৃত হবে।

বিলঃ

বিল ঃ
বৃহৎ আকৃতির প্রাকৃতিক জলধার। যে গুলোতে ভূ-প্রষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরীন পান নিষ্কাশনের মাধ্যমে জমা হয়ে থাকে। সব বিলের উৎপত্তির কারণ এক নয়। কোন কোন বিল প্রাকৃতিক, আবার কোন কোন বিল প্রয়োজনে খনন করা। ঐতিহ্যবাহী চতরা ইউনিয়নের বেশ দুইটি বিল আছে। যেমন ঃ-
০১। চাপড়ার বিল-১.১৫ একর। মৌজা-চন্দনপাট।
০২। লাহিড়ীরহাট পুকুর-০.৬৯ একর। মৌজা-সাহাবাজপুর।

এই দূইটি বিল ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট বিল আছে। সয়রাতভূক্ত বিল গুলো মৎস সমিতির আওতায় ইজারা নিয়ে মৎস চাষ করে অনেক ম্যুনষ জীবিকা নির্বাহ বরে। এছাড়া সায়রাত বহির্ভূত ভিল গুলোতে প্রাকৃতিক প্রচুর মাছ থাকায় এলাকার মানুষজন মাছ ধরে আমিষের চাহিদা মেটায়।

লাহিড়ীরহাট পুকুরঃ

ব্রিটিশ আমলে নীল চাষীদের মাধ্যমে ইংরেজরা এই পুকুরটি খনন করেন্। পুকুরের পূর্ব পার্শ্বে বধ্যভূমি সমঋতিসৌ ও ঈদগাহ্ মাঠ এবং উত্তর পার্শ্বে কবরস্থান। এই পুকুরটিতেই সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ বিজয়া দশমীতে দূর্গা পূজা বিসর্জন দিয়ে থাকেন এর্ব বিজয়া দশমীতে এখানে মেলা বসে।

নদী ঃ

ঘাগট নদী ঃ

বাংলাদেশের উত্তরাাঞ্চলের রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ঘাঘট নদী। দৈর্ঘ্য-১২২ কিলোমিটার, প্রস্থ-১৪৪ কিলোমিটার।
রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে ঘাঘট নদী। ক্রমান্বয়ে সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করে হরিদেবপুর দিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন হয়ে চন্দনপাট ইউনিয়নের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রবেশ করেছে।।

এক সময় ক্ষরস্রোতা ঘাঘট নদীতে চলতো বিশালাকৃতির নৌকা, জেলেরা মাছ ধরতো, ছেলে-মেয়েরা সাঁতার কাটতো এবং নৌকাবাইচে মেতে উঠতো নদীপারের মানুষ। নদী ঘিরেই ছিল এ অঞ্চলের মানুষের কৃষি, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি। একন নদীর নব্যতা হ্রাস পাওয়ায় শ্রীহীন ও গতিহারা মরা খালে পরিনত হয়েছে। আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগে নদীতে জাল ফেলেই হরেক রকমের/প্রজাতির মাছ মিলতো। কিন্তু এখন অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে।

বর্তমানে ঘাঘট নদীর তীরে জেগে ওঠা ধূ-ধূ বালু চর সবুজ ফসলে ভরে গেছে। ক'বছর আগেই সেখানে জায়গা-জমির কদর ছিলো না। এখন ধূ-ধূ বালু চরে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল ও বন্যায় পলিমাটি জমায়, চরগুলি উর্বও আবাদি জমিতে পরিনত হয়েছে।

চরের জমিতে গম, ভুট্টা, গোল আলু, মিষ্টি আলু (শ্যাকআলু), মরিচ, টমেটো, পটল, করলা, তিসি, ডেরস, শাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মূলা ও ধনিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের রবি ফসল চাষ করে এ অঞ্চলের মানুষ অভাবকে করেছে জয়। রবি ফসল উৎপন্ন হওয়ায় চরের জমির দাম হয়েছে আকাশচুম্বী। ফসলের কারণে চর গুলি যেন দিগন্ত বিস্তৃত দৃষ্টি জুড়ানো সবুজ ফসলের ক্ষেত।

কৃষি বিভাগ থেকে অর্থকারী ফসল চিনাবাদাম ও মশুরের ডাল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঘাঘট নদী

ছবি: উপরের ছবিতে যাদবপুর মৌজায় প্রবাহিত ঘাঘট নদী

ঘাগট নদী ঃ-------------

রংপুর বিভাগের ২য় বৃহত্তম খরস্রোতা নদী তিস্তা। এই তিস্তা নদীর শাখা ঘাঘট। নামকরনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঘাঘট হল নদ। কী কারনে আদিকাল থেকে নদী বলা হয় তা গবেষনার বিষয়। যা-হোক আমরাও নদী বলে সম্মোধন করি।

ঘাঘট নদীর তীরে বিভাগীয় শহর রংপুর অবস্থিত।

নদীতে পানির পরিমান কম হওয়ায় না আছে মাছ আর বালুর কারনে না হয় ফসলের চাষ। নদীর তলদেশ পলিপড়ে ভরাট হওয়ায় বর্ষাকালে দুপাড়ের জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। কৃষক হয় সর্বশান্ত। গৃহস্থ থেকে হয় শ্রমিক মজুর। তাই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ঘাঘট নদী খননের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী বলে ইউনিয়ন বাসী মনে করে।বাংলাদেশের উত্তরাাঞ্চলের রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ঘাঘট নদী। দৈর্ঘ্য-১২২ কিলোমিটার, প্রস্থ-১৪৪ কিলোমিটার।

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদী থেকে উৎপত্তি হয়েছে ঘাঘট নদী। ক্রমান্বয়ে সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করে হরিদেবপুর দিয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন হয়ে চন্দনপাট ইউনিয়নের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রবেশ করেছে।।

এক সময় ক্ষরস্ত্রোতা ঘাঘট নদীতে চলতো বিশালাকৃতির নৌকা, জেলেরা মাছ ধরতো, ছেলে-মেয়েরা সাঁতার কাটতো এবং নৌকাবাইচে মেতে উঠতো নদীপারের মানুষ। নদী ঘিরেই ছিল এ অঞ্চলের মানুষের কৃষি, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি। একন নদীর নব্যতা হ্রাস পাওয়ায় শ্রীহীন ও গতিহারা মরা খালে পরিনত হয়েছে। আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগে নদীতে জাল ফেলেই হরেক রকমের/প্রজাতির মাছ মিলতো। কিন্তু এখন অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে।

চন্দনপাট ইউনিয়নে অবস্থিত সরকারী স্থাপনা সমুহঃ

ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ছবি: চন্দনপাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ইউনিয়নের চন্দনপাট মৌজায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস অবস্থিত। পূর্বে ইহা তহশীল অফিস হিসাবে পরিচিত ছিল। তহশীল অফিসের প্রধানকে তহশীলদার বলা হতো। বর্তমানে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রদানকে উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা বলা হয়। জমির খাজনা আদায় জমির নাম খারিজ জমা একত্রিকরণ প্রভৃতি ভূমি বিষয়ক কার্যাদি এখানে করা হয়।

ডাকঘর

ছবি: লাহিড়ীরহাট পোস্ট অফিস।

ছবি: মাটিয়াপাড়াহাট পোস্ট অফিস।

চন্দনপাট ইউনিয়নে ৪টি ডাকঘর বা পোস্ট অফিস আছে, লাহিড়ীরহাট, বালাচওড়াহাট, শ্যামপুর ও চন্দনপাট। আগে ডাক বিভাগের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের চিঠি পত্র মানি অর্ডার পার্শেল, ভিপি ইত্যাদি আদান-প্রদান হত। বর্তমানে মানুষের হাতে হাতে মোবাইল হওয়ায় ডাকঘরের কর্মচারীরা অলস সময় অতিবাহিত করছে। সরকার বিকল্প কাজের দায়িত্ব দিয়ে ডাকবিভাগ কে কর্ম চাঞ্চল্য রাখার পরিকল্পনা করছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ

ছবি: চন্দনপাট বাবুপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প

ছবি: চন্দনপাট কালাপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প।

চন্দনপাট ইউনিয়নে অবস্থিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমুহঃ

ইউনিয়নের একমাত্র পেট্রোল পাম্পঃ

ছবিঃ মেসার্স খালেক পেট্রোলিয়াম

ইউনিয়নের সাহাবাজপুর মৌজায় একমাত্র পেট্রোল পাম্প মের্সাস খালেক পেট্রোলিয়াম অবস্থিত। এখানে ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেন পাওয়া যায়।

ইউনিয়নের একমাত্র কোল্ড ষ্টোরেজ ঃ

ছবি: শ্যামপুর কোল্ড ষ্টোরেজ লিমিটেড

ইউনিয়নের শ্যামপুর মৌজায় একমাত্র কোল্ড ষ্টোরেজ শ্যামপুর কোল্ড ষ্টোরেজ লিমিটেড অবস্থিত। এখানে আলু সংরক্ষন করা হয়।

চন্দনপাট ইউনিয়নের খেলাধুল ও সংস্কৃতিঃ

খেলাধুলা ঃ

ক্রিড়া ও সংস্কৃতি		
ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
০১	খেলাধুলা সংগঠন বা ক্লাব	৯টি
০২	সাংস্কিতিক সংগঠন	০১ টি
০৩	গণ-গ্রন্থাগার	-
০৪	ফুটবল টুর্নামেন্ট	০১টি
০৫	ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	০১ টি
০৬	হাডু-ডু টুর্নামেন্ট	-
০৭	ভলিবল টুর্নামেন্ট	০১ টি

খেলাধুলার বর্ণনা :

ক্রীড়া বা খেলাধুলা শরীর চর্চা ও আনন্দ লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্রিয়াকলাপ। সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন। ব্যক্তিজীবন,পারিবারিক জীবন, এমনকি জবীনের সফলতা লাভের পেছনে কাজ করে সুস্থ ও সুঠাম দেহ। আর এই সুস্থ দেহ গঠনের জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিহার্য।

বিধান চন্দ্র রায় এর ভাষায়,

"সংগ্রামী জীবনে মানুষকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য খেলাধুলার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য"। তাই জীবন গঠনের সূচনায় সব শ্রেনীর ক্ষেত্রেই খেলাধুলা শিক্ষার উপায় হওয়া উচিত। সময়ের সাথে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ব্যায়াম, দাবা ইত্যাদী খেলার ব্যবস্থা রাখতেছে বা রাখা উচিত। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বার্ষিক ক্রীড়া ও বিভিন্ন আন্ত টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। যা শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পাঠদান, শরীর চর্চা ও মানসিকতা সহ অনুপ্রেরনা দানে যতেষ্ট ভূমিকা রাখে।

"স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল"

উক্তিটি আসলেই সত্য। শরীর বা স্বাস্থ্য ভাল না হলে জীবনের প্রতিটি মূর্হুতে ভোগান্তিতে পড়তে হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না । আর স্বাস্থ্যকে সুন্দর,সঠিক ভাবে গড়ার হাতিয়ার হল খেলাধুলা।

একজন শিশুর শারীরিক, মানসিক,দৈহিক ও ব্যক্তিগঠনে খেলাধুলার গুরত্ব ও প্রয়োজনীয় অপরিসীম। খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত থাকলে যে সকল উপকার পাওয়া যায় তা তখনকার প্রযুক্তি নির্ভর প্রজন্ম বুঝতে চেষ্ঠা করে। ফলে আজকের সমাজে বিভিন্ন অপরাধ মূলক কর্মকান্ড, অপ্রতিকর কাজ, মাদকাসক্ত,গাঁজায় লিপ্ত হচ্ছে আজকের প্রজন্ম। তাই এগুলো

থেকে বের হয়ে আসতে খেলাধুলার কোন বিকল্প নাই। খেলাধুলায় অংশ নিলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত গুনাবলী অর্জন করে বা জাগ্রত হয় তা নিম্নরুপ-

১। স্বাস্থ্যই সম্পদ

২। মানসিক বিকাশ

৩। জাতীয়তাবোধ তৈরী

৪। শৃঙ্খলাবোধ

৫। যোগাযোগ বৃদ্ধি

৬। শিক্ষার মান বৃদ্ধি

৭। ভালকাজের মধ্যে সময় কাটানো

৮। একাগ্রতা বৃদ্ধিতে সহায়তা

৯। অর্থ রোজগারের মাধ্যম, ইত্যাদী বিষয় খেলাধুলার সাথে জড়িত। তাহলে কেন আজকের যুব সমাজরা এগুলো থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখবে। তাই ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের সফল ও জন নন্দিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমান হচ্ছেন একজন রুচিশীল মানুষ। খেলাধুলার সাথে নিজেকে নিয়োজিত করতে, রাখতে ভালবাসেন।

পরিশেষে,আজকের প্রজন্মরা খেলাধুলার সাথে থাকুক-খেলাধুলা নিয়ে যে কোন আয়োজন, টুর্নামেন্ট সহ ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ আছে আগামীতেও থাকবে। খেলাধুলা হোক আজকের প্রজন্মের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম সেই আশা ও প্রত্যাশা রাখছে ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ।

ছবি: মাটিয়াপাড়াহাট খেলার মাঠ

ছবি: সাহাবাজপুর খেলার মাঠ

খেলাধুলার ঐতিহ্যে চন্দনপাট ঃ-----

ফুটবল ঃ

ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। এটি বৈশ্বিকভাবে ব্যাপক জনপ্রিয় ও পরিচিত। খেলাটি আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন (ফিফা) কর্তৃক পরিচালিত হয় ।বর্তমানে চন্দনপাট ইউনিয়নের কিছু উল্লেখযোগ্য খেলোয়ার হচ্ছে রজব আলী, জাকির হোসেন, তপন কুমার, সাগর মিয়া, মাহাফুজার রহমান এবং লিয়ন মিয়া।

মহিলা ফুটবল ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে মহিলা ফুটবল দল আছে। দলগুলো বিভিন্ন সময়ে উপজেলায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশ গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করে যাচ্ছে।

ক্রিকেট ঃ

বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও স্কুল কলেজে ক্রিকেট দল আছে। দলগুলো ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মাঠে খেলার চর্চা করে থাকে।

ভলিবল ঃ

শীত মৌসুমে ঐতিহ্যবাহী চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রায় গ্রামে ও বাজার সংলগ্ন মাঠে যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে জমজমাট ভাবে ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হা-ডু-ডু খেলা ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু। চন্দনপাট ইউনিয়নে প্রায় এলাকাতেই হয়ে থাকে। ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মাঠে হা-ডু-ডু খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোড়দৌড় ঃ

বৈশাখী মেলায় চন্দনপাট ইউনিয়নে ঘোড়দৌড় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেলোয়াড়রা ঘোড়া নিয়ে এসে খেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে চন্দনপাট ইউনিয়নের কালাপাড়ায় নবান্ন উৎসবে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাডমিন্টন ঃ

প্রতিবছর ডিসেম্বর মাস জুড়ে চন্দনপাট ইউনিয়নে ক্রীড়ামোদী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড়দের নিয়ে জমজমাট ভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতিঃ

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের সফল ও জন নন্দিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আমিনুর রহমান হচ্ছেন একজন রুচিশীল মানুষ। তাই সংস্কৃতির সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে ভালবাসেন।

তাই স্থানীয় শিল্পি গোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদের জাতীয় দিবস সমুহ উদযাপন করা হয়ে থাকে।

চন্দনপাট ইউনিয়নের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমুহঃ

হরিপুর জামে মসজিদ ঃ

চন্দনপাট ইউনিয়নের আধুনিক সময়ের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনা ও বিশেষ স্থান। এটি বালাচওড়াহাটের দক্ষিন-পূর্বদিকে হরিপুর মৌজায় অবস্থিত। এটি মূলত একটি বৃহৎ কবরস্থান এবং সাথে সংযুক্ত একটি মসজিদ নিয়ে গড়ে উঠেছে। দুই তলা বিশিষ্ট এই মসজিদটি প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক স্থাপত্য নির্মাণ শৈলীতে নির্মিত। এলাকার জনগনের সার্বিক সহযোগীতায় মসজিদটি নির্মিত। এই মসজিদটিতে একসঙ্গে প্রায় ৫০০ জন মুসল্লি নামায আদায় করতে পারেন।

চন্দনপাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ঃ

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী মাটিয়াপাড়াহাট/বাজারেরর দক্ষিণ পাশে তৎকালীন জিএমসির দক্ষিণ পার্শ্বে শতবর্ষী যা চন্দনপাট ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বা মাটিয়াপাড়াহাট জামে মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি টাইলস্কৃত দ্বিতল ভবন এবং তৃতীয় তলার কাজ চলমান। মনোরম পরিবেশ এবং শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে পুরাতন এই মসজিদটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে সাথে ২০০০ জন মুসল্লী অনায়াসে নামাজ আদায় করতে পারে।

সাহাবাজপুর দুই পীরের মাজার, নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা, লিল্লাহবোডিং ও এতিমখানা ঃ

লতিব ফকির, ওয়াজ ফকির ও চামার ফকির নামে তিন ব্যক্তি সাহাবাজপুরে বসবাস করতেন , চামার ফকির অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরনকরেন, লতিব ফকির নিসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। ওয়াজ ফকির খেদমত করতেন ও উক্ত স্থানে বসবাস করতেন। উক্ত স্থানে গাড়ী নষ্ট হলে ভালো করার অনেক চেষ্টা করার পরও গাড়ী ঠিক হয়না। তারপর জৈনক ওয়াজ ফকিরের কথামত ইটের টুকরা গাড়ীর নিচে দিয়ে মাজারে মানত করলে গাড়ী ঠিক হয়। তখন থেকে উক্ত স্থানে সাপ্তাহিক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বৈশাখ মাসে বার্ষিক ইছালে সাওয়াব ও ওয়াজ মাহফিল হয়। পরবতীর্তে আনুমানিক ৪০-৪৫ বছর পূর্বে ওয়াজ ফকিরের পরিচিত আজগার আলী কালু ফকির সাহাবাজপুরে মারা যান, তাবে কবর দেওয়া হয় ওয়াজ ফকিরের কবরের পূর্ব পাশে। মাজারের খাদেম মৃত আব্দুর সাত্তার ২০ বছরের মত খেদমত করেন এবং দ্বিতীয় খাদেম ছমিউল্লাহ এলাকার গন্যমান্য লোক জন আলোচনা করে এই মাজারের নাম দেন সাহাবাজপুর দুই পীরের মাজার।

অতপর আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর পূর্বে সাহাবাজপুর দুই পীরের মাজারকে কেন্দ্র করে হাফিজীয়া মাদ্রাসা ও লিল্লাহবোডিং এবং এতিমখান নির্মিত হয়। মাজারের জমির পরিমান ঃ ৩৮ শতক।

সাহাবাজপুর দুই পীরের মাজার নুরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা লিল্লাহবোডিং ও এতিমখানা ঃ

আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল হুদা ক্বওমী মাদ্রাসাঃ

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিদ্যোৎসাহী ধর্মপ্রাণ মানুষ একত্রিত হয়ে ২০০৪ খ্রিঃ চন্দনপাট ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ স্থান শ্যামপুর বন্দরে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল হুদা ক্বওমী মাদ্রাসা" স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্র সংখ্যা-২৫৫ জন।

প্রতিষ্ঠানটিতে একটি টিন শিট একাডেমিক ভবন আছে এবং আটতলা ভিত্তি বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণধীন। আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল হুদা ক্বওমী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের সহায়তায় ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানটির পাশে শ্যামপুর বন্দর ঈদগাহ মাঠ খেলার মাঠটি চন্দনপাট ইউনিয়নের মুসল্লিদের ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য নির্ধারিত। আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল হুদা ক্বওমী মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহর ফজলে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে। অত্র মাদ্রাসার সমস্ত কার্যক্রম ছায়াবাহে কেরামগন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদগনের আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত।

চিত্রঃ আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল হুদা ক্বওমী মাদ্রাসা

মরহুম ফছির উদ্দিন দরবেশ মাজার ঃ

মোঃ ফছির উদ্দিন চন্দনপাট গ্রামের পাইকান পাড়ায় বসবাস করতেন, তিনি মাটিয়াপাড়া হাটে কলা ও ডিম বিক্রয় করতেন এবং বিক্রয় লব্ধ টাকা দিয়ে সংসার চালাতেন। তিনি দরবেশ হওয়ায় দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন ইসলামী জলসা ও হলকা করতেন। এলাকায় ফছির উদ্দিনের অনেক জনপ্রিয়তা ছিল। ১৯৯১ সালে ফছির উদ্দিন দরবেশের মৃত্যু হলে তাহার মৃত দেহ শ্যামপুর কবর স্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তৎক্ষানাৎ এলাকার সুধী সমাজ ও চন্দনপাট ইউপি জামে মসজিদ কমিটিবৃন্দ ফছির উদ্দিনের লাশ শ্যামপুর কবর স্থানে নিতে না দিয়ে মাটিয়াপাড়াহাটে চন্দনপাট ইউপি জামে মসজিদ সংলগ্ন ফছির উদ্দিন দরবেশের ব্যবসার স্থানে কবর দেন। এলাকায় ফছির উদ্দিনের অনেক জনপ্রিয়তা থাকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাহার কবর স্থান জিয়ারত করতে আসতেন এবং দান করতেন। তখন থেকে উক্ত স্থানে সাপ্তাহিক মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে বার্ষিক ইছালে সাওয়াব ও ওয়াজ মাহফিল হয়।

সাহাবাজপুর ধামবাড়ি মন্দিরঃ

গঙ্গা প্রবাহেন্দু জটাধরায় ত্রিলোচনায় স্মরকালহন্ত্রে।
সমস্ত দেবৈরভি পূজিতায়শ্রীবৈদ্যনাথায় নমঃশিবায়॥

বৈদ্যনাথ হলো ভগবান শিবের সহস্র নামের মধ্যে একটি। সুস্থ দেহ ও মননিয়েকিভাবে সপরিবেশ বেঁচে থাকা যায়, সে-চলার কৌশল শিবের অধিগত। তাই তার অপর নাম বৈদ্যনাথ। বৈদ্য তিনিই যিনি বিদ্যমান তার সমস্ত মরকো চগুলি জানেন যা জীবনকেঅসুস্থ করে তোলে, তারকা রণ অপসারণ করে জীবনকে সুস্থ ও সুস্থ করে তোলে তাকে বৈদ্য বলে। মঙ্গলময় শিবের মধ্যে বৈদ্যনাথ ত্বস্বতঃউৎসারিত থাকে।

মূল বাবা বৈদ্যনাথ ধাম ভারতের অধুনা ঝাড়খন্ড রাজ্যের দেওঘরে অবস্থিত। বৈদ্যনাথ ধাম হলো শিবের দ্বাদশ জ্যোতি র্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ। বৈদ্যনাথ ধাম হলো ৫১শক্তি পীঠেরও অন্যতম শক্তি পীঠ।

পারিবারিক পুরানো নথিপত্র ঘেটে জানা যায় যে, রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন সাহাবাজপুর গ্রামে শ্রীশ্রী বৈদ্যনাথ ধাম প্রতিস্থিত হয় উনিশশতকের শেষের দিকে বা আনুমানিক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। উনিশশতকের ৫০, ৬০ এবং৭০দশকে অত্র অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ দাশ ছিলেন একজন নামকরা কবিরাজ এবং শিবও শক্তির উপাসক। তিনি কৃষ্ণ দাস কবিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণ দাস কবিরাজের পুত্র শ্রী উমাকান্ত ও ছিলেন একজন নামকরা কবিরাজ। উমাকান্ত কবিরাজের সহধর্মিনী শ্রীমতি প্রেমময়ী দেবী ছিলেন একজন একনিষ্ঠ শক্ত উপাসক। প্রেমময়ী দেবী সর্বদা শিব ও কালীর আরাধনা করতেন এবং তিনি নিজেই শিবপূজা, দূর্গাপূজা, কালীপূজা, তন্ত্রপূজা, চরকপূজা করতেন। যোগিনী হিসেবে তার প্রচুর সুখ্যাতি ছিলো। এই উমাকান্ত ও প্রেমময়ী দম্পতী ১৮৮০ সালের কোন একসময় তীর্থ ভ্রমনের নিমিত্তে ভারতের দেওঘরে অবস্থিত শিবের দ্বাদশ জ্যোতি র্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীশ্রী বৈদ্যনাম ধামে যান। সেখানে শ্রীমতি যোগিনী প্রেমময়ী দেবী পূজা দিকর্মসেরে যমুনা নদিতে স্নান করতে নদিতে ডুব দিলে তার স্পর্শে একটি শিব লিঙ্গ আসে। তিনি স্নান শেষে সেই শিব লিঙ্গ সাথে নিয়ে আসেন। এবংঐ দিন রাতেই তিনি ভগবান শিব কতৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে বাড়ীতে এসে যথাবিহিত নিয়ম ও উপাচার অনুসারে শিব লিঙ্গ প্রতিস্থাপন, বছরে দুইবার - বৈশাখ ও কার্তিক মাসের শেষ সোম বারে দিনব্যাপি মহাধুমধামে শ্রীশ্রী বৈদনাথের পূজা করতে হবে।
তীর্থ ভ্রমণ শেষে উমা কান্ত ও প্রেমময়ী দম্পতি বাড়িতে এসেই স্বপ্নে শিবের আদেশ অনুসারে বাবা বৈদ্যনাথের নামে মন্দির নির্মাণ, শিব লিঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং পূজা শুরু করেন।
শুরুতে বৈদ্যনাথ মন্দিরটি টালি এবং বাশ দিয়ে নির্মিত ছিল। প্রেমময়ী দেবী নিজেই দৈনান্দিন পূজা ও সার্বিক ব্যবস্থানায় ছিলেন।
পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে উমাকান্ত ও প্রেমময়ী দম্পতির একমাত্র ছেলে সন্তান ডাঃ মনোজ গীতা চার্য্য নিজ অর্থায়নে ইট ও কংক্রিট দ্বারা ঐ স্থানেই মন্দিরটি পুনঃ নির্মান করে যা বর্তমানে অপরিবর্তিত আছে। ডাঃ মনোজ গীতাচার্য্য যাকে এ অঞ্চলের সবার নিকট মনমোহন ডাক্তার নামে পরিচিত ছিলেন। মনমোহন ১৯১০ সালের দিকে ভারতের কোলকাতা থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা শেষে তার মায়ের আদেশে নিজ এলাকায় চিকিৎসা বিদ্যা দিয়ে এলাকার জনগনের সেবায় এবং বাবা বৈদ্যনাথের ভক্তি ও পূজায় নিজকে নিয়োজিত করেন। মা-বাবার মতো তিনি ও শক্তি পূজার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং নিজেকে একজন সার্থক যোগি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজে শিবপূজা, কালীপূজা, দূর্গাপূজাসহ সব ধরনের পূজা করতেন। তিনি গীতায় বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করে গীতাচার্য উপাধি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি হিন্দু ধর্মের সমস্ত গ্রন্থে পান্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মীও, খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মী ও গ্রন্থেও পান্ডিত্য লাভ করেন। প্রায় একশত বছর পূর্বে তার নিজ হাতে লেখায় কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের পঠন পদ্ধতি ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করছেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আরবি, হিন্দি ও উর্দু ভাষাতে ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি সামাজিক কুসংসস্কার মানতেন না এবং সব ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় গোড়ামী ও অনিয়মের কঠর সমালোচক ছিলেন ও প্রতিবাদ করতেন । তিনি ১৯৭৯ সালে পরোলোক গমন করেন এবং তার মৃত্যুর
প্রায় ৪৫ বছর পরেও এখনোও এলাকার হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে তিনি সমাধৃত।

ডাঃ মনমোহনের একটি পুত্র ও তিন কন্যা ছিলো। তার একমাত্র পুত্রের নাম হলো শ্যামল গোস্বামী যাকে সবাই শ্যামাপদ বলে ডাকতো। শ্যামাপদ একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেনএবং মাধ্যমিক পাশ করেন। তিনি ও ধর্মীয় বিভিন্ন গ্রন্থ আত্মস্থ করেন। শ্যামাপদ গোস্বামীর স্ত্রীর নাম শ্রীমতি মায়া দেবী। এই দম্পতীর তিনটি সন্তান – দুই ছেলে এবং একমেয়ে। কিন্তু শ্যামাপদ গোস্বামী মাঝে মধ্যেই মানসিক ভারসাম্য হারাতেন। এতে মন্দির ব্যবস্থাপনায় সমস্যা দেখা দিত। তিনি ১৯৮৮ সালে ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরন করেন।

শ্যামাপদ গোস্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় তার পিতা ডাঃ মনমোহন বাবা বৈদ্যনাথের পূজা ও মন্দির ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠ ও নিয়মিত রাখার জন্য তিনি তার দৌহিত্র্য তথা তার মেজো মেয়ের বড় ছেলে ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে নিজের কাছে রেখে ডাক্তারী পড়াশুনা ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। ডাঃ মনমোহনের ১৯৭৯ সালে মৃত্যুর পর থেকে

ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ গোস্বামী পরম নিষ্ঠা ও ভক্তির সাথে বাবা বৈদ্যনাথের পূজাদি ও মন্দিরের সার্বিক ব্যাবস্থাপনা পরিচালনা করেন। ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ গোস্বামী ২০১৬ সালে মৃত্যু বরন করেন।

ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ গোস্বামী মৃত্যুর পর ডাঃ মনমোহনের পৌত্র্য তথা শ্যামাপদর দুই পুত্র- বড় ছেলে সন্জয় গোস্বামী যাকে এলাকায় সবাই সনৎ নামে ডাকে ও ছোট ছেলে পলাশ গোস্বামী শ্রীশ্রী বৈদ্যনাথ ধামের শুরু থেকে চলমান ঐতিহ্য ও ভাবগাম্ভির্য্য বজায় রেখে পূর্ব পুরুষদের মতো পরমনিষ্ঠা, ভক্তি ও উপাচার সহকারে বাবা বৈদ্যনাথের পূজাদি কর্মসম্পাদন ও মন্দির ব্যবস্থাপনা করে আসছেন।

শ্যামাপদ গোস্বামীর বড় ছেলে সন্জয় গোস্বামী ভারত থেকে ইংরেজী সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা ও MBA ডিগ্রি অর্জন করে ২০০২ সালেদেশে আসেন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আসছেন। সন্জয় গোস্বামীর সহধর্মিনী শ্রীমতি মিতা বিশ্বাস ভারত থেকে ইংরেজী সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা শেষে এখন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন। মিতা বিশ্বাস একজন স্বীকৃতি প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক যোগা ট্রেইনার। এই দম্পতির দুই সন্তান- বড়
ছেলে দিগন্ত গোস্বামী পিয়াল , ২০২৩ সালে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পাশ করে এবং মেয়ে স্বস্তিকা গোস্বামী পৌষী নবম শ্রেণীতে পড়ে। পৌষী ও দিগন্ত দুজনেই ২০২২ এবং ২০২৩ সালে জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগীতায় পর্যায়ক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক বিজয়ী।

শ্যামাপদ গোস্বামীর ছোট ছেলে পলাশ গোস্বামী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি শেষে PhD করছেন। গত এক দশকের বেশি সময় থেকে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থায় গবেষনা ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করে আসছেন। পলাশ গোস্বামীর স্ত্রী শ্রীমতি অনুসূয়া সরকার একজন মাস্টার্ষধারী এবংগৃহিনী। এই দম্পতির একমাত্র কন্যাসন্তান- টুইংকেল গোস্বিমী কেজীতে আধ্যায়নরত।

কালীগঞ্জ সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরঃ

কালীগঞ্জ সার্বজনীন দূর্গামন্দিরটি ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যলয় সংলগ্ন মাটিয়াপাড়াহাটের উত্তর পাশে অবস্থিত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং জমি দাতা জমিদার বংশের ননী গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় পিং প্রমথ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সরযু বালা দেবী জং সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই কালীগঞ্জ সার্বজনীন দূর্গা মন্দিরে প্রকৃত পক্ষে ১৯২৯ ইং সাল থেকে ১৯৪৭ ইং পর্যন্ত জমিদারের পরিচালনায় মহাধুমধামে শুধু কালীপূজা উদ্‌যাপন হত। যাহা সি এস খতিয়ানে ভদ্রা কালীস্থান নামে উল্লেখিত। যাহার খতিয়ান নং ৯২২, জে এল নং ২৫, দাগ নং ৫০১৭। জমির পরিমান ৪ (চার) শতক। এই ভদ্রাকালী দেবীর অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনা যায়, যাহা এখনো বিদ্যমান। আর এ কারণে তৎকালীন সময়ে অনেকে এই স্থানকে কালীগঞ্জ হিসাবে আখ্যায়িত করেন বলে জানা যায়। ১৯৪৭ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে মন্দিরটি ভাটা পড়ে যায়। ভাটা পড়ার কারণে এখানে অনেক অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জানা যায়।তাই স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে পূনরায় পূজা শুরু হয়। পরবর্তি সময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৮০-১৯৮১ অর্থ বছরে তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মজিবর রহমানের তত্তাবধানে একটি কমিটি গঠন করে দূর্গা মন্দিরের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করা হয়। তারপর থেকে দূর্গা পুজা শুরু হয়। পরবর্তিতে নিয়মানুসারে কমিটি পরিবর্তনের মাধ্যমে চন্দনপাট ইউনিয়নের হিন্দু ধর্মাবলম্বী ধর্মপ্রান ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতায় উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। ২রা আগষ্ট ২০১০ ইং তারিখে তৎকালীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয় এ্যাডঃ শ্রী রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবুসোনা) দূর্গা মন্দিরের ছাদ ঢালাইয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তী সময়ে ২০২১ ইং সালে কালী মন্দিরের নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়। বর্তমানে এই মন্দিরে দূগাপূজা, কালীপূজা, লক্ষীপূজা ও সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয় এবং এখানে একটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রটি ০৪/০৮/২০১৩ ইং তারিখের আবেদনের পেক্ষিতে ১১/০২/২০১৫ ইং তারিখে অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়ও উক্ত মন্দিরটি ২২/০১/২০১৭ ইং তারিখে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তালিকা ভূক্ত হয়। তার তালিকা ভুক্তির সনদ নং রংপুর/৩৪৪। বর্তমানে অত্র মন্দিরটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক বাস্তবায়িত কিছু উন্নয়ন চিত্রঃ

ছবি: ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক বাস্তবায়িত কিছু উন্নয়ন স্থির চিত্র।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরন।

ছবি: ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক বাস্তবায়িত কিছু উন্নয়ন স্থির চিত্র।

জেলা প্রশাসক রংপুর মহোদয়ের নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনায় ভিক্ষুক মুক্ত ও পূর্নবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে ভিক্ষুক পূর্নবাসনের লক্ষ্যে ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়নের ভিক্ষুকগনকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বাছুর সহ গাভী ও বাকনা গরু প্রদানঃ

ছবি: ভিক্ষুক পূর্নবাসনের লক্ষ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের গাভী ও বাকনা গরু প্রদনের স্থির চিত্র

উন্মুক্ত বাজেট সভাঃ

ছবি: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত বাজেট সভার স্থির চিত্র

উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভাঃ

ছবি: উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভার স্থির চিত্র

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম ও সেবা সংক্রান্ত উন্মুক্ত গনশুনানিঃ

ছবিঃ উন্মুক্ত গনশুনানির স্থির চিত্র

৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক কর নিরুপণ ও আদায় বিষয়ক প্রশিক্ষনের

ছবিঃ ৩নং চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক কর নিরুপণ ও আদায় বিষয়ক প্রশিক্ষনের স্থির চিত্র।

চন্দনপাট ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় পরিদর্শন ছবিঃ

ছবি: চন্দনপাট ইউনিয়নের সাহাবাজপুর বদ্ধভূমিতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ফুলেল শুভেচ্ছার স্থির চিত্র।

চন্দনপাট ইউনিয়নের চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়ে সচিব, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মতবিনিময় সভাঃ’

ছবিঃ চন্দনপাট ইউনিয়নের চন্দনপাট উচ্চ বিদ্যালয়ে সচিব, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মতবিনিময় সভার স্থির চিত্র।

জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয়ের চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনঃ

ছবিঃ জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয়ের চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনের স্থির চিত্র।

জনাব আলিয়া ফেরদৌস জামান, উপসচিব,স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর মহোদয়ের চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনঃ

ছবি: জনাব আলিয়া ফেরদৌস জামান, উপসচিব,স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর মহোদয়ের চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনের স্থির চিত্র।

জনাব জিলুফা সুলতানা, উপপরিচালক (উপসচিব) স্থানীয় সরকার, রংপুর মহোদয়ের চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনঃ

ছবিঃ জনাব জিলুফা সুলতান, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, রংপুর মহোদয়ের চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনের স্থির চিত্র।